অলবেরুনীর দেখা ভারত

প্রেমময় দাশগুপ্ত



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
* কলিকাতা *

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম সংস্করণ ১৯৬০

মুদ্রাকর :
এ. টি. দাস
রূপশ্রী প্রেস
১৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

—আমাদের কথা—

অতীতে ভারতের বুকে যে সব বিদেশী পর্যটক তাঁদের চরণচিহ্ন এঁকে গেছেন, তাঁদের সকলে না হলেও কিছু পর্যটক তাঁদের দেখা ভারতের কাহিনী ও ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা উত্তরকালের জন্য লিখে রেখে গেছেন। এসব কাহিনী একদিকে যেমন ভ্রমণ-সাহিত্য, অন্যদিকে তেমনি ইতিহাসের উপাদান। এর মধ্যে অনেকের লেখা কাহিনীই রম্যতায় ও বৈচিত্র্যে উপন্যাস বা অ্যাডভেনচার কাহিনীর চেয়েও মনোরম। আর সব চেয়ে বড়ো কথা এগুলি কাল্পনিক নয়, সত্যিকারের জীবন-উপন্যাস ও অ্যাডভেনচারের কাহিনী। আমাদের স্মৃতির কুঠুরী থেকে হারিয়ে যাওয়া অনেক কালপর্বের ইতিহাসকে, অনেক অজানা ঘটনাকে এথেকে আমরা জানতে পারি। জানতে পারি আমাদের গৌরবের পাশাপাশি দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতাকেও, অতিমাত্রায় অভ্যস্ত বলে যেগুলি সহজে আমাদের নিজেদের চোখে ধরা পড়ে না। ইতিহাসের পুরো মালাটিকে গেঁথে তুলতে এগুলি আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে, করছে।

সাহিত্য হিসাবে, ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বিদেশী পর্যটকদের এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলি কি শিশু কি বৃদ্ধ আমাদের প্রত্যেকেরই পড়া উচিত। শুধুমাত্র ইতিহাস-গবেষকদের গবেষণার মাল-মশলা হয়ে থাকা কোনমতেই উচিত নয়। মাতৃভাষায় এগুলিকে সকলের হাতে তুলে দেবার প্রয়াস আগে হয়ে থাকলেও তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাই এগুলির অনুপম রসাস্বাদনে মুষ্টিমেয় ইংরাজী-শিক্ষিত ইতিহাস-অনুরাগী ছাড়া আর সকলেই বঞ্চিত থেকেছেন। এ বাধা দূর করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। এজন্যেই 'বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ' গ্রন্থমালা প্রকাশের মতো এক কঠিন ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় হাত দেয়া হয়েছে।

ভ্রমণ কাহিনীর স্বাদ, সাহিত্য-রস ও ইতিহাস-উপাদানের গুরুত্ব ও মূল্য বজায় রেখে এগুলিকে সকলের হাতে তুলে দেয়া সহজ কথা নয়। যাতে এর দাম কেনার ইচ্ছায় বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেজন্য এসব কাহিনীর মধ্যে থাকা অপ্রয়োজনীয় গালগল্প ছাটাই করে বইয়ের ন্যূনতম সীমানার মধ্যে রাখার

কথা ভাবতে হয়েছে। কোন দরকারী অংশ যাতে বাদ না পড়ে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এতোসব দিক বজায় রেখে প্রতিটি বই যাতে সাধারণ পাঠকের ভালো লাগে ও ইতিহাসের ছাত্রদের কাজে লাগে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেই এর ভাষান্তর, সম্পাদনা ও প্রকাশনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর আগে আমাদের প্রকাশিত "ফা-হিয়েনের দেখা ভারত" ছিল পুরা মূল পুস্তকের অনুবাদ। এবারের বইগুলি হবে মূলের সংক্ষেপিত সংস্করণ।

'মারকো পোলোর দেখা ভারত' এই গ্রন্থমালার প্রথম বই, 'অলবেরুনীর দেখা ভারত' দ্বিতীয়। অলবেরুনীর মূল গ্রন্থটি আকারে বড়ো হলেও এমন সব বিষয়ের আলোচনায় ভরপুর যা সাধারণ পাঠকের ভালো লাগবে না, ইতিহাস সন্ধানীরও কোন প্রয়োজনে আসবে না। ওই সব বিষয়বস্তু ও তথ্য তিনি প্রচলিত পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন, যা ভারতবাসীর কাছে কোন নতুন কথা নয়। তাই ওই সব অপ্রয়োজনীয় অংশকেই শুধু এ বইতে বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইতিহাসের ছাত্ররা স্বাচ্ছন্দে এ বইগুলিকে ব্যবহার করতে পারেন।

এ বইখানি ও পুরো গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা সুধীমহলে ও পাঠকমহলে সমাদৃত হলে প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো।

প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয়

[ক]	অলবেরুনী	১
[খ]	অলবেরুনীর 'ভারত'	৮
এক :	ভারত-চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা	১৮
দুই :	হিন্দুধর্ম ও দর্শন	২৯
তিন :	মূর্তিপূজার প্রচলন ও হিন্দু দেব-বিগ্রহ ...	৩২
চার :	বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্র-গ্রন্থ	৩৬
পাঁচ :	হিন্দু শাস্ত্র : জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ ...	৪১
ছয় :	লেখার উপকরণ, গণিত, আজব প্রথা ও আচার-ব্যবহার	৪৫
সাত :	জাদুকলা ও রসায়ন	৫৭
আট :	জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ও জ্যোতিষ ...	৬৪
নয় :	ভারতের ভৌগলিক বিবরণ ও বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা	৮১
দশ :	ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন এবং বিচার ব্যবস্থা ...	৯৭
	শব্দসূচী	১০৯

ভ্রম সংশোধন

৬ পৃষ্ঠার একাদশ লাইনে 'মাহমুদের' বদলে 'মসুদের' পড়তে হবে

বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ গ্রন্থমালার অন্য কয়েকটি বই

মারকো পোলোর দেখা ভারত

ইবন বাতুতার দেখা ভারত

ইৎসিঙের দেখা ভারত

মানুচির দেখা ভারত

তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত

॥ অলবেরুনী ॥

অলবেরুনী ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক খিবা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। খিবাকে সে সময় খওয়ারিজম বা চোরাসমিয়া বলা হতো। অলবেরুনীর পুরা নাম অবু রৈহান মুহম্মদ ইবন আহমদ অলবেরুনী। স্বদেশবাসীরা তাকে আবু রৈহান বলেই ডাকতেন।

কলা ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে নাম করার পর তিনি নামলেন রাজনীতির আসরে। নিজ রাজ্যের মামুনী বংশীয় রাজার পরামর্শদাতা হলেন। মামুনী রাজাকে তিনি যেসব পরামর্শ দিতেন তা গজনীর সুলতান মাহমুদের স্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতো। তিনি ছল খুঁজে ফিরছিলেন কী করে এ রাজ্যটিকে গ্রাস করবেন। শেষ পর্যন্ত একটি ছুতো করে সে দেশ আক্রমণ করলেন ও মামুনী রাজবংশের পতন হলো।

খিবা জয় ক'রে নিজের একজন সেনাপতিকে শাসনকর্তার পদে বসিয়ে মাহমুদ গজনী ফিরে এলেন। আসবার সময়ে খিবা সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশ, মামুনী পরিবারের সব রাজকুমার ও রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বন্দী বা জামিন রূপে নিয়ে এলেন। শেষ দলে যারা ছিলেন অলবেরুনী তাদের মধ্যে একজন।

ভারতীয় চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার বাসনা অলবেরুনীর মনে দীর্ঘকাল ধরে ছিল। ইসলাম সাহিত্যে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বই বিশেষ কিছু ছিল না তখন। এ অভাব পূরণের ইচ্ছাও তার মনকে বিশেষভাবে দোলা দিতো। বাধ্যতামূলক পরবাস জীবনে সে সুযোগ পেয়ে গেলেন অলবেরুনী। ভারতের কাবুল ও মূলতান অঞ্চল তখন মাহ্‌মুদের রাজ্যাধীন। এই ভারতীয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান ক'রে তিনি এবার ভারত-চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১০১৭ খ্রীঃ থেকে ১০৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত ১৩ বছর কাল তিনি সময় কাটালেন সংস্কৃত ভাষা শিখে ভারতের নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে। কীরূপ পরিবেশের মধ্যে এ কাজ তাকে করতে

হয়েছে তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় তার বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে ব্যক্ত করেছেন। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি সেখানে লিখেছেন—"ভারতের সব কিছুর অবস্থা তখন এ রকম। বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নের পথ সুগম ক'রে তুলতে আমাকে রীতিমত বেগ পেতে হলো। অথচ এর প্রতি আমার গভীর অনুরাগ রয়েছে। আমার সময়ে এরূপ চর্চার ক্ষেত্রে আমিই একমাত্র ব্যক্তি। যেসব অঞ্চলে সংস্কৃত পুঁথি থাকতে পারে বলে মনে হয়েছে সেখান থেকে তা সংগ্রহ করতে যে কোন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে ও বিপদের ঝুঁকি নিতে পিছপা হইনি। দ্বিধা করিনি যে কোন সুদূর প্রান্ত থেকে হিন্দু পণ্ডিত সংগ্রহ করতে যিনি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ ও আমাকে শেখাতে পারেন। যাই হোক, কোন্ গুণী ব্যক্তির এমন অনুকূল সুযোগ রয়েছে এ বিষয় অধ্যয়ন করবার, যেমনটি আমার আছে? ভগবানের অনুকম্পা অন্য সবাইকে শুধু একটি জিনিষই দিয়েছে, যা আমার নেই। তা হল, নিজের কাজ-কর্ম্ম ও যাতায়াতের ব্যাপারে নিজের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা। কারণ, নিজের কাজকর্মের ব্যাপারে আমার ভাগ্যে কখনো পূর্ণ স্বাধীনতা জোটেনি। এরূপ যথেষ্ট ক্ষমতাও আমাকে দেওয়া হয়নি যা থেকে আমি যখন যেরূপ প্রয়োজন সেই মতো প্রভাবিত করতে বা আদেশ করতে পারি।" অর্থাৎ অধ্যয়নের জন্য আর্থিক অসুবিধা তেমন কিছু না থাকলেও স্বাধীন ভাবে কাজকর্ম ও চলাফেরা করার সুবিধা তার ছিল না। এ থেকে মনে হয় রাজনৈতিক বন্দী বা জামিনরূপে, মোটামুটি সম্মানজনক সর্তে, কতকগুলি রাজকীয় বাধা-নিষেধের মধ্যে থেকে তাকে এ অধ্যয়ন চালাতে হয়েছিল। পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে আরও সুষ্ঠু ও ব্যাপক ভাবে অধ্যয়ন এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সম্ভবতঃ তিনি রাজকীয় আনুকূল্য ও আর্থিক সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সুলতান মাহ্‌মুদ ও তার উজীর মইমনদী বেঁচে থাকা পর্যন্ত সরকারী :পোষকতা লাভ করার সৌভাগ্য তার হয়নি। তাদের দু'জনের

কেউ-ই কলা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগী ছিলেন না। তার উপর অলবেরুনীকেও তারা ঠিক সুনজরে দেখতেন না। তারা ভালো করেই জানতেন যে খিবা অঞ্চল গ্রাসের ব্যাপারে এ লোকটিই ছিল তাদের প্রধান অন্তরায়, মূল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ।

অলবেরুনী তাই তার বইতে দুঃখ করে বলছেন—"কলা আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। যে সব গুণী এ সবের সাধনা করেন তাদের মন দৈনন্দিন প্রয়োজনের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখতে পারেন একমাত্র তারাই। তারাই এ সব গুণীর মধ্যে উত্তরোত্তর খ্যাতি, সাফল্য ও প্রতিদান লাভের বাসনা সঞ্জীবিত করতে পারেন। এ আকাঙ্ক্ষাই হলো মানব প্রকৃতির অস্থিমজ্জা। কিন্তু বর্তমান কাল সে রকম নয়। বরঞ্চ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে কোন নতুন বিজ্ঞানের বিকাশ বা নতুন ধরনের কোন গবেষণা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যে সব বিজ্ঞান এখন আমাদের রয়েছে তা অতীত হয়ে যাওয়া ভালো দিনগুলিতে বিকশিত জ্ঞানের নগণ্য অবশেষ মাত্র।" এখানে 'বর্তমান কাল' যদিও একমাত্র মাহ্‌মুদের ৩৩ বছর রাজত্বকালকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি তবু মাহ্‌মুদও যে এর অন্যতম শরব্য এতে কোন সন্দেহ নেই। শাসক-পদে থাকার জন্য কলা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করার যে মহান দায়িত্ব মাহ্‌মুদের উপর বর্তেছে তা পালন না করার অপরাধে ফিরদৌসী ও অলবেরুনী দু'জনেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করে গেছেন।

মাহ্‌মুদের পুত্র মসুদ সুলতান হবার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। তবে সঙ্গে সঙ্গেই নয়। বোধ হয় ১০৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উজীর মইমনদীর মৃত্যুর পর। তখন উজীর পদে আসেন আবু-নসর আহমদ ইবন মুহম্মদ ইবন আবদুস-সমদ। ১০১৭ থেকে ১০৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি অলবেরুনীর স্বদেশ খিবার শাসনকর্তা ছিলেন। অলবেরুনী ও মইমনদী পরস্পরের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও, অলবেরুনী ও

আবদুস-সমদের মধ্যে ওইরূপ সম্পর্ক ছিল না। এর ফলে হয়ত মামুদের আনুকূল্য লাভ তার পক্ষে সহজ হয়েছিল।

সাংখ্যদর্শন ও পতঞ্জলির যোগদর্শন-এর অনুবাদ প্রকাশের পর অলবেরুনী 'ভারত' রচনার কাজ স্থরু করেন। এই কাজ আরম্ভের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মাহ্‌মুদের মৃত্যু হয়। আর মস্থদের আনুকূল্য লাভের আগেই বইটি প্রকাশ পায়। 'ভারত' মধ্যে তিনি মাহ্‌মুদের প্রতি আপন মনের অশ্রদ্ধা প্রকাশ ক'রে তার কার্যকলাপকে যে ভাষায় ব্যক্ত করেন তারপর কোনরূপ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ নিশ্চয়ই তার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তাই এই স্থযোগ লাভ করে তিনি খুবই খুশী হলেন। অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ ক'রে এবার তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাটি (Canon Masudicus) লিখলেন। মস্থদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে তার নামানুসারে গ্রন্থখানির নাম দিলেন অলকানুন অলমস্থদি। তাছাড়া উৎসর্গ পত্রে উচ্ছসিত ভাষায় তার প্রশস্তি করলেন।

সবুক্তগীন ও মাহ্‌মুদের সঙ্গে তুলনা করলে মস্থদকে অযোগ্য স্থলতান রূপে অভিহিত করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন মদ্যপ। মাহমুদ তার অস্ত্রবল ও কূটনীতির জোরে ৩৩ বছরে যে সব অঞ্চলে তার অধিকার বিস্তার করেন, মস্থদ মাত্র ১০ বছর মধ্যেই তার অধিকাংশ অঞ্চল হারান। কিন্তু এ সত্ত্বেও অলবেরুনী 'ভারত' বইতে যে ভাষায় মাহ্‌মুদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অলকানুন অলমস্থদীতে যে রূপ উচ্ছসিত ভাবে মস্থদকে প্রশংসা করেছেন তা অনেককেই অবাক করবে। কিন্তু প্রথম বইটিতে অলবেরুনীর যে নির্ভীক মনোভাব ও বিচার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে বলা যেতে পারে যে কলা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির প্রতি মাহ্‌মুদের অনুরাগের অভাব ও তার পীড়নমূলক বর্বর নীতির জন্যই অলবেরুনী তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেননি। অপর দিকে মস্থদের উদারতা (অন্ততঃ পক্ষে তার প্রতি) ও কলা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির প্রতি

অনুরাগ বা পৃষ্ঠপোষণা তার প্রতি অলবেরুনীকে শ্রদ্ধাশীল ক'রে তুলেছিল।

সুলতান মাহমুদের পীড়নমূলক বর্বর নীতি ও সংস্কৃতি-বিহীন দৃষ্টি-ভঙ্গীর জন্য অলবেরুনী প্রকৃতপক্ষে তাকে সুলতান পদের অযোগ্য রূপে বিবেচনা করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় সেকথা ব্যক্ত না করলেও পরোক্ষভাবে ব্যক্ত ক'রে গেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে 'ভারত' বইটিতে তিনি কোথাও মাহ্‌মুদকে 'সুলতান' রূপে উল্লেখ করেননি। করেছেন 'আমীর' রূপে। ['আমীর মাহ্‌মুদ', 'আমীর মাহমুদ, ভগবানের অনুকম্পা যেন তার প্রতি থাকে', 'আমীর মাহ্‌মুদ. ভগবানের করুণা যেন তিনি লাভ করেন']। ভারতের প্রতি তার বর্বর নীতির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"এই সময়ে তারা (তুর্কীরা) সামনী বংশের অধীনে গজনী অধিকার করেন। প্রধান ক্ষমতা লাভের সৌভাগ্য হলো সবুক্তগীনের। জিহাদ বা ধর্ম্ম-যুদ্ধের ডাককে এই রাজা নিজের 'বুলি' রূপে বেছে নিলেন। অল্-ঘাজী (ভগবানের পথ অনুসরণ করে সংগ্রামে নিযুক্ত) বিশেষণে ভূষিত করলেন নিজেকে। আপন উত্তরাধিকারীদের স্বার্থে (লক্ষ্য করবার বিষয় যে 'ইসলামের স্বার্থে' বলেননি) ভারত সীমানাকে দুর্বল ক'রে তুলবার অভিপ্রায়ে তিনি বহু রাস্তা তৈরী করলেন। আর সেই সব পথ দিয়েই তিরিশ বছর বা তারও বেশি যমীন-অলদৌল মাহ্‌মুদ ভারতে প্রবেশ ক'রে চললেন। পিতা ও পুত্র দু'জনকেই ভগবান যেন করুণা করেন। মাহ্‌মুদ পুরোপুরি এ দেশের সমৃদ্ধি নষ্ট করেন। সেখানে বিস্ময়কর লুণ্ঠন চালান। এর ফলে হিন্দুরা ধূলির অণুর মতো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। প্রাচীন কালের কাহিনীর মতো এ কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।" একজন মুসলমান হয়ে অলবেরুনীর এই নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিবরণ নিশ্চয়ই সবুক্তগীন ও বিশেষভাবে মাহ্‌মুদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পরিচয় দেয় না। এরপর রাজরোষ-

এর পরিবর্তে রাজানুকূল্য লাভ তাকে যে অভিভূত করে তুলেছিল—তিনি যে মত্তপ ও 'অযোগ্য' মসুদের মধ্যে একজন উদার ও সংস্কৃতিবান জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুরাগী মানুষকে দর্শন করেছিলেন—এতে সন্দেহ নেই।

মসুদের সময়ে তিনি যে শুধু রাজানুগ্রহ লাভ করেন তা নয়। রাজ দরবারেও তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বোধ হয়, তখন গজনীতে বাস করার দরুন এই প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। অর্থও পাচ্ছিলেন নিয়মিত ভাবে অধ্যয়নের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য। পরবর্তীকালের প্রাচ্য লেখকেরা তাকে রাজা মাহমুদের দরবার-জ্যোতিষী বলে মনে করতেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। তথ্যাদি থেকে তা সমর্থিত হয় না। বোধ হয় মাহমুদের সময়ে তিনি যে রাজানুকূল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তা থেকেই পরবর্তীকালে এ ধারণা দেখা দিয়েছিল।

পঁচাত্তর বছর বেঁচেছিলেন অলবেরুনী। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বোধ হয় হেন বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি চর্চা করেননি বা লেখেননি। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, তারিখ গণনা বিদ্যা, গাণিতিক ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, খনিজ বিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, জ্যোতিষ, ইতিহাস প্রভৃতি সবগুলি বিজ্ঞানেই তার দখল ছিল। এর মধ্যে প্রথম সাতটি বিষয় নিয়ে তিনি প্রধানতঃ লেখনী চালনা করেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে আপন স্বদেশ খিবার ইতিহাস ও কারমত (Karmatains) সম্প্রদায়ের ইতিহাসও তিনি লিখে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু বই দুইটি বর্তমানে লুপ্ত। ভারত বিষয়ক অনুবাদ ও মূল রচনার সংখ্যাও প্রায় কুড়ির কাছাকাছি। এছাড়া আছে প্রাচীন ভারত ও ইরাণের সাহিত্য থেকে নেওয়া নানা গল্প ও উপাখ্যান।

ভারত বিষয়ক অনুবাদগুলির মধ্যে পতঞ্জলির যোগদর্শন, কপিলের সাংখ্য, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘৃণিত

রোগ সম্পর্কিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থেরও আরবী অনুবাদ করেছিলেন।

গজনীতে ফিরে আসার পর বা 'ভারত' বইটি রচনার পর অলবেরুনীর ভারত চর্চায় সম্ভবতঃ ছেদ পড়ে। কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত 'অলমস্‌উদী' বইতে ভারতের বিষয় তিনি খুব কমই উল্লেখ করেছেন। এই বইতে হিন্দু অব্দাদি সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন তাতে 'ভারত' বইতে যা দেয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু দেখা যায় না। বরঞ্চ ব্রহ্মগুপ্তের জ্যোতিষিক অব্দটির সঙ্গে তিনি গুপ্তকালকে গুলিয়ে ফেলেছেন এ বইটিতে।

১০৪৮ অব্দে অলবেরুনীর মৃত্যু হয়।

॥ অলবেরুনীর 'ভারত' ॥

অতীত ভারত-পর্যটকদের দীর্ঘ তালিকায় হিউয়েন সাঙ ও অলবেরুনী দু-ই বিশেষ ব্যতিক্রম। হিউয়েন সাঙ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন ও ১৫ বছর এখানে কাটান। অলবেরুনী ১০১৭ থেকে ১০৩০ পর্যন্ত ১৩ বছর কাল। এরা সাধারণ পর্যটকের মতো উপর উপর চোখ বুলিয়ে এদেশ নিয়ে মনোরম ও আজগুবি গালগল্পের বই লিখতে চাননি। নিজের দেশ ও জাতির কাছে দুজনেই এদেশ ও জাতির ঠিক ঠিক পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন, একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপহার দিতে চেয়েছেন। আর এজন্য যা যা করা প্রয়োজন তাও নিজ নিজ সাধ্য ও সুযোগ মতো তারা করেছেন। তারা এদেশের ভাষা শিখেছেন। এখানকার লোকজনদের সঙ্গে মিশেছেন। এজাতির জ্ঞান-ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। লোকজনের চাল-চলন আচার-ব্যবহার প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। দুজনেই তাদের সময়কার বিশিষ্ট জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে না। তবু দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির মধ্যে অনেক ব্যবধান। হিউয়েন সাঙ এখানকার শিল্প-সংস্কৃতি-সভ্যতাকে সকলের গোচরে আনতে চেয়েছেন সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকের মতো। গোঁড়া বৌদ্ধ শ্রমণ হয়েও তিনি হিন্দু দেবমূর্তি ও মন্দিরের শিল্প সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়েছেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদ্যানৈপুণ্যেও তিনি মুগ্ধ হতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। তিনি মানুষের মধ্যে বাইরের সৌন্দর্যের চেয়ে অন্তরের সৌন্দর্য বেশি খুঁজেছেন। কিন্তু অলবেরুনী জ্ঞানের গজকাঠি হাতে নিয়ে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-সভ্যতাকে পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-সভ্যতায় ভারত পৃথিবীর মধ্যে সেরা —ভারতীয় ব্রাহ্মণদের এ ধারণা বা দাবী ঠিক কি ভুল তা সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নিরূপণ করতে চেয়েছেন।

বিচারকের কাজ করার যোগ্যতা যে অলবেরুনীর আছে তার পরিচয় তিনি তার বইয়ের অসংখ্য স্থানে দিয়েছেন। কিন্তু একাজটি আরো ভালভাবে করতে পারতেন। এজন্য প্রয়োজন ছিল এ অহঙ্কার ত্যাগ করা যে, (১) তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, ভারতীয় কোন পণ্ডিতই তার তুল্যমূল্য নয়। (২) যেহেতু তিনি একজন মুসলমান অতএব তার কর্তব্য মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা, এই প্রবণতা বর্জন। (৩) আরো ব্যাপকভাবে হিন্দু-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ভ্রমণ।

ব্যাপকভাবে হিন্দু শাস্ত্র বই অধ্যয়ন ও ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা অলবেরুনীর ছিল। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষাকে কাজে পরিণত করার স্বাভাবিক সুযোগ তার ছিল না। রাজনৈতিক বন্দী বা জামিন অবস্থায় নানা বিধিনিষেধের মধ্যে বাস ক'রে তাকে ভারত-অধ্যয়ন করতে হয়েছে। সুলতান মাহমুদ অধিকৃত ভারতের বাইরে যাবার অনুমতি তার ছিল না। এমনকি মাহমুদ শাসনাধীন ভারত মধ্যেও তিনি সব জায়গায় যেতে পারেননি, সেটুকু অবাধ গতি-বিধির স্বাধীনতাও তার ছিল না। মাহমুদের রাজত্ব ভারত মধ্যে স্থানেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু অলবেরুনী রাবি ও সিন্ধু নদীর পূর্ব উপকূলে শিয়ালকোট, লাহোর ও মুলতান পার হয়ে ভিতরে এগোবার সুযোগ পাননি। একথা তার নিজের লেখাতেই স্পষ্ট। বইয়ের ৩১ পরিচ্ছেদে তার দেওয়া বিভিন্ন স্থানের দেশান্তর তালিকায় এ তিনের পরবর্তী আর কোন শহরের উল্লেখ নেই। আর, তিনি সেখানে খোলাখুলি বলেছেন: 'এখানে যে দেশগুলির কথা বলা হলো তার ওপারে এদেশের (ভারতের) আর কোন অঞ্চলে যাবার সুযোগ আমাদের হয়নি।' অর্থাৎ, ভারতের এখনকার (১৯৪৭ পরবর্তী) মানচিত্র অনুসারে তিনি মোটে ভারতেই আসেননি। আর, তার সময়কার ভারত উপমহাদেশের ভৌগলিক মানচিত্র অনুসারে তিনি যে হিন্দু এলাকাগুলি দেখেছেন, তার অধিকাংশই হিউয়েন সাঙের মতে 'সঠিকভাবে ভারতবর্ষীয় নয়। তারা ভারতের প্রান্তিক সীমানার

অধিবাসী ও বর্বর ভাব-অভ্যাস প্রবণ।' তাছাড়া মাহমুদের লুঠ, অত্যাচার ও জবরদস্তি ধর্মান্তরের দরুন অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিত ভারতের ভিতর অঞ্চলগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যাতে লুঠ বা ধ্বংস হয়ে না যায় সেজন্য ভারতীর পুঁথিগুলিকেও ভিতরে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। ভারতীয় শাস্ত্রবিদ্যার মূল বিদ্যাপীঠ কাশ্মীর ও বারাণসীও তার নাগালের বাইরে ছিল।

এ অবস্থার মধ্যে ভারত চর্চা করতে গিয়ে তাকে যে সব দুস্তর বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে, সেগুলি নিপুণভাবে বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি যে কারণ দেখিয়েছেন সেগুলি অকাট্য। সেই পরিচ্ছেদটি পড়লেই পাঠক তা বিশদভাবে জানতে পারবেন। এককথায় তাকে আমরা এইভাবে সাজাতে পারি: (১) ভাষার প্রতিবন্ধকতা ও ত্রুটিশূন্য পুঁথির অভাব (২) ধর্মীয় ব্যবধান (৩) চালচলন রীতিনীতির দুস্তর ব্যবধান (৪) হিন্দুদের মনে নানা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে দেখা দেয়া মুসলমান বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব (৫) হিন্দুদের অদ্ভুত চারিত্রিক প্রবণতা, কূপমণ্ডুকতা ও অন্য জাতির প্রতি তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা ভাব। নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার অপরের কাছ থেকে গোপন রাখার প্রয়াস। এসব বাধা পার হয়ে ভারত-চর্চার যতখানি সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন তাও আত্ম-অহঙ্কারের জন্য তিনি কাজে লাগাতে পারেননি বলে মনে হয়। এবিষয়ে প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি নিজমুখে যেকথা বলে গেছেন সেদিকে একটুখানি চোখ বোলানো যাক।

"তাদের মধ্যে নবাগত হয়ে, তাদের বিশেষ জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও পরম্পরাগত বিজ্ঞানধারার সঙ্গে পরিচিত না থাকার দরুন, প্রথমে আমি তাদের জ্যোতির্বিদদের কাছে শিষ্যের মতো শিক্ষা গ্রহণ শুরু করি। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আমি তাদের দেখাতে আরম্ভ করলাম যে, কোন মৌলিক ভিত্তির উপর এ বিজ্ঞান আধারিত। যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তে যাবার কতগুলি নিয়ম দেখালাম। গণিতের নানা-

রকম বিজ্ঞানানুগ পদ্ধতি দেখিয়ে দিলাম। তারা আশ্চর্য হলো। তারপর আমার কাছে শেখার আগ্রহ নিয়ে তারা আমার চারিদিকে ভিড় জমাতে শুরু করল। আবার সেই সঙ্গে এপ্রশ্ন করতেও আরম্ভ করলো যে, কোন হিন্দু আচার্যের কাছ থেকে এসব আমি শিখেছি। তখন খোলাখুলি আমি দেখিয়ে দিলাম যে তাদের মূল্য কতটুকু। তাদের সঙ্গে এক স্তরভুক্ত রূপে নিজেকে গণ্য করতে অস্বীকার ক'রে আমি তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম যে, নিজেকে আমি তাদের চেয়ে অনেক বড়ো মনে করি। আমাকে তারা একরকম বলতে গেলে যাদুকর বলে মনে করতে লাগলো। তারা তাদের প্রধান ব্যক্তিদের কাছে মাতৃভাষায় আমাকে 'সাগর' বলে অভিহিত করলো।"

যদি তিনি "কিছুদুর অগ্রসর" হবার পরিবর্তে, শিক্ষাসম্পূর্ণ করার ধৈর্যটুকু দেখাতে পারতেন ভালো করতেন। এর ফলে ও নিজেকে সব ভারতীয় জ্যোতির্বিদের চেয়ে বড়ো বলে অহমিকা দেখাবার ফলে তিনি ভারতীয়দের কাছে 'সাগর' আখ্যা লাভ করেছিলেন—ঠিক। কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র শেখার পথটি মুছে দিয়েছিলেন। তার শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল, তা তার কাছে ধরা পড়েনি বলে মনে হয়। যারা ভারতীয় জ্যোতিষ সম্পর্কে অভিজ্ঞ তারা জানেন যে অষ্টোত্তরী, বিংশোত্তরী প্রভৃতি দশা-গণনা ভারতীয় 'নিরায়ণ' জ্যোতিষের এক বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচলিত 'সায়ণ' জ্যোতিষে এ দশা-গণনা নেই। সম্ভবত জ্যোতির্বিদ পরাশরই এইসব দশা-গণনার প্রবর্তক। তিনি তার বইতে ৪২টি দশা-গণনা দিয়ে গেছেন। অলবেরুনী তার বইয়ের আশিটি পরিচ্ছেদ মধ্যে ৫২টি পরিচ্ছেদ জুড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অথচ ভারতীয় জ্যোতিষের এই আসল জিনিষটুকুই তাতে নেই। অলবেরুনী যে একে ইচ্ছে করে বাদ দিয়েছেন তা মোটেই নয়। তিনি তার বইতে এমন অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না, যা তার বইয়ের মুসলিম পাঠকদের কোন

কাজে আসবে না—যেমন সংস্কৃত ছন্দ ও তার মাত্রাবৃত্ত। আবার কোন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান না থাকলে যতটুকু তিনি জানেন ততটুকুই পাঠককে জানিয়েছেন ও অকপটে নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছেন। এথেকে বোঝা যায়, ভারত সম্পর্কে যে বিষয়ে যতটুকু তিনি জানতে পেরেছেন, তার সবটুকুই তিনি পাঠককে বা জাতিকে উপহার দিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে ভারতীয় জ্যোতিষের দশা-পদ্ধতির কথা জেনেও তিনি তার বইতে দেননি একথা মনে করা চলে না। আবার ভারতীয় জ্যোতিষ সম্বন্ধে নিজের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কথাও তিনি কোথাও বলেননি। সুতরাং পরিষ্কার, নিজের অসম্পূর্ণতার কথা তিনি নিজেই জানতেন না। ভারতীয় জ্যোতিষের আর একটি বিশেষ শাখা—নাদি সংহিতা, ভৃগু সংহিতা সম্বন্ধেও তিনি নীরব। সুতরাং মনে হয় এগুলির কথাও তিনি জানতে পারেননি। আসলে, ভারতীয় জ্যোতিষ সম্পর্কে যা তিনি জেনেছেন—সে শুধু বরাহমিহিরের লেখা বইগুলি পড়েই। আর তা পড়েই ভেবেছেন ভারতীয় জ্যোতিষ সম্বন্ধে আর কিছু জানার নেই।

জ্যোতির্বিজ্ঞানক্ষেত্রেও তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় আর্যভট্ট ও তাদের অনুগামীদের লেখা বই পড়েননি। বোধহয় সংগ্রহ করতে পারেননি। তাদের বিষয় যতটুকু যা জেনেছেন ব্রহ্মগুপ্ত ও বরাহমিহিরের বই থেকে বিক্ষিপ্তভাবে। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে ঘোরে তারা এই মতের সমর্থক ছিলেন। অলবেরুনী স্বীকার করেছেন যে, এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তার নিজের ভাষায়—"সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে পৃথিবীর আবর্তন কোনভাবেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের স্থিতিকে কোনরকম ক্ষুণ্ণ করে না। অন্য মতবাদটির মতো (অর্থাৎ, সূর্য্য ঘোরে ও পৃথিবী স্থির) এ মতবাদটি দিয়েও জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় বিষয়গুলিকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু অন্য কতগুলি কারণ রয়ে গেছে যা একে অসম্ভব ক'রে তোলে। এ প্রশ্নগুলির সমাধান বেশ দুরূহ। বর্তমান ও অতীতের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বিষয়টি

নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেছেন ও তাকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। আমরাও এবিষয়ে 'মিফতাহ-ইলম-আলহাইয়া' (জ্যোতির্বিজ্ঞানের চাবিকাঠি) নামে একটি বই লিখেছি। আমাদের ধারণা ভাষার দিক থেকে না হলেও, অন্যান্য সবদিক দিয়ে এতে আমরা পূর্ববর্তীদের ডিঙেয়ে যেতে পেরেছি।" অর্থাৎ, পৃথিবী স্থির এ সিদ্ধান্তকে তিনি শেষ পর্যন্ত সমর্থন করেছেন ও তার সপক্ষে সেরা যুক্তি তথ্য দিতে পেরেছেন বলে গৌরব করেছেন। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চেয়ে নিজেকে বড়ো বলে মনে করার একটি কারণ বোধহয় এ বইটি। কিন্তু আমরা আজ জানি যে পৃথিবী স্থির এ ধারণাটি ভ্রান্ত, পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে ঘুরে চলে ১ম ও ২য় আর্যভট্ট ও তাদের অনুগামীদের এ মতবাদই ঠিক। সুতরাং তার আত্ম-অহমিকা, তিনি সব ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চেয়ে বড়ো এ বড়াই 'প্রকৃত জ্ঞান'-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলেই প্রমাণিত হয়। এখানে এপ্রশ্নও তোলা যায় যে দুই আর্যভট্ট ও তাদের অনুগামীদের বইগুলি না পড়ে, তাদের যুক্তি ও তথ্যগুলিকে খণ্ডন না ক'রে এধরণের বড়াই করা তার উচিত হয়েছে কি ?

হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট এপ্রশ্ন সমাধানের একটি চমৎকার সূত্র অলবেরুনী তার বইতে দিয়েছেন ঃ

"হিন্দুরা আমাদের চেয়ে পৃথক ও উৎকৃষ্ট বলে দাবী করে। আমরাও বিপরীতভাবে ওইরকম দাবী করি। এপ্রশ্নের মীমাংসা সহজেই ক'রে নেয়া যেতে পারে তাদের ছেলেদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে। যেসব হিন্দু ছেলে নতুন নতুন মুসলমান অঞ্চলে আসে তাদের মধ্যেও আমি এমন কাউকে দেখিনি, যে কিনা নিজেদের রীতিনীতি ভালোভাবে জানে না। তবু সে তার মালিকের জুতোজোড়া উলটোভাবে রাখে। ডানদিকেরটি বাঁদিকে, বাঁদিকেরটি ডান দিকে। পাট ক'রে রাখতে গিয়ে মালিকের পোষাকটিকে উলটিয়ে নিয়ে পাট করবে। গালিচা পাততে গিয়ে উলটো দিকটাই উপরের দিকে পাতবে। এমনি আরো

অনেক কিছু। আর এর সবটাই হলো হিন্দু প্রকৃতি মধ্যে দেখা দেয়া সহজাত বিকৃতির নিদর্শন।"

একজন প্রখর জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি একটি জটিল সমস্যা সমাধানের কী সরল রাস্তাই না দেখিয়েছেন!

এরপর, পরের অনুচ্ছেদটি পড়লে মনে হবে যে হিন্দু প্রকৃতির নানা সহজাত বিকৃতির জন্য ব্যথিত পাঠকদের তিনি এ সমস্যা সমাধানেরও সরল উপায় বাতলে দিয়েছেন।

"যাইহোক, এসব পৌত্তলিক আচার-আচরণের জন্য শুধু হিন্দুদেরই তিরস্কার করা উচিত নয়। পৌত্তলিক আরবরাও এরকম নানা অপরাধ ও অশ্লীলতা করেছেন। তারা ঋতুমতী ও গর্ভবতী নারীর সঙ্গে সহবাস করেছেন। একজন নারীর সঙ্গে এক ঋতুকাল মধ্যে একাধিক লোক একত্রে সহবাস করেছেন। তারা অন্যের দ্বারা জাত বা অতিথিদের দ্বারা জাত সন্তানকে গ্রহণ করেছেন, নিজের কন্যার প্রেমিকের পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেছেন। কয়েক ধরনের পূজার সময় তারা তাদের আঙুল দিয়ে শীষের শব্দ তুলতেন, হাততালি দিতেন। ঘৃণিত ও মৃত পশুর মাংস খেতেন। ইসলাম আরবদের মধ্য থেকে সেসব প্রথা দূর করেছে। ভারতের যেসব অঞ্চলের লোকেরা মুসলমান হয়েছে তাদের মধ্য থেকেও ওই সব (খারাপ হিন্দু) প্রথা দূর করেছে। ভগবানকে এজন্য ধন্যবাদ।"

অলবেরুনীর মুসলমান হৃদয়ে আঘাত ও ক্ষোভ সৃষ্টি হবার মতো কারণও অবশ্য ছিল। তিনি নিজেই আমাদের জানিয়েছেন—"চাল-চলন রীতিনীতির দিক থেকেও তারা আমাদের থেকে এতো আলাদা যে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের আমাদের পোষাক-আশাক, আচার-আচরণ, রীতি-প্রথা নিয়ে ভয় দেখায়। শয়তান আমাদের সৃষ্টি করেছে ও যাকিছু ভালো ও ন্যায়সঙ্গত, আমাদের কাজকর্ম ঠিক তার উলটো—এরকম বলে বেড়ায়।" (প্রথম পরিচ্ছেদ)

তার মতো জ্ঞানী-গুণী চতুর ব্যক্তির পক্ষে এর মূল কারণও বোঝা

শক্ত হয়নি। তিনি এর ঐতিহাসিক কারণগুলি প্রাঞ্জলভাবে প্রথম পরিচ্ছেদে প্রকাশ করেছেন। এর সর্বশেষ কারণটি তার মতে সুলতান মাহমুদের পীড়ন ও অত্যাচার। "সেই থেকে তুর্কীদের সময় পর্যন্ত আর কোন মুসলমান বিজেতা কাবুলের সীমারেখা কিংবা সিন্ধুনদী পার হননি। এসময়ে তারা (তুর্কীরা) সামানীবংশের অধীনে গজনী অধিকার করেন। প্রধান ক্ষমতা লাভের সৌভাগ্য হলো নাসির-অদ্দৌল সবুক্তগীনের। এই রাজা জিহাদের ডাককে নিজের বুলি হিসাবে বেছে নেন। নিজেকে অল-ঘাজী বিশেষণে ভূষিত করেন। আপন উত্তরাধিকারীদের স্বার্থে ভারত-সীমানাকে দুর্বল ক'রে তোলার জন্য বহু রাস্তা তৈরী করালেন। সেইসব পথ দিয়েই তিরিশ বছর বা তার বেশিকাল ধরে যমীন-অলদ্দৌল মাহমুদ ভারতে প্রবেশ ক'রে চলেন। পিতাপুত্র দুজনের প্রতি ভগবান করুণাপরবশ হোন্। মাহমুদ এদেশের সমৃদ্ধি পুরোপুরি নষ্ট করেন। বিস্ময়কর লুণ্ঠন চালান। ফলে, হিন্দুরা ধূলির অণুর মতো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। পুরাকাহিনীর মতো এ কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।"

তিনি এখানে সত্য কথা বলার বিস্ময়কর সৎসাহস দেখিয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও চরম সত্য কথাটিকে সচেতন ভাবে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছেন। সেটি হলো—জোর জবরদস্তি ধর্মান্তর।

অলবেরুনী নিজেই বলে গেছেন "যারা তাদের (হিন্দুদের) ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত নয় তাদের তারা সম্প্রদায় ভুক্ত হতে দেয় না। এমনকি কেউ যদি ওইরূপ ইচ্ছা দেখায় বা তাদের ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয় তা হলেও না।"

এক্ষেত্রে হিন্দুরা যে জোর ক'রে ধর্মান্তরকে ঘৃণার চোখে দেখবে, বর্বর ও ধর্ম-বিপরীত কার্যকলাপ বলে মনে করবে এ অতি স্বাভাবিক।

অবশ্য পৌত্তলিক হিন্দুদের ধর্ম-দর্শন-কৃষ্টি-সভ্যতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার অপরাধে মুসলমানদের হাতে দোষী সাব্যস্ত হবার ভয়ে অলবেরুনী যদি এই মুসলমান প্রবণতা দেখিয়ে থাকেন তবে সতন্ত্র কথা। সেক্ষেত্রে বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের দোষত্রুটি অলবেরুনী যে মন্তব্যের সঙ্গে উপেক্ষা করেছেন, আমরাও সেভাবেই একে উপেক্ষা করবো। "বরাহমিহিরের যেসব উক্তির সঙ্গে এর আগে আমাদের পরিচয় হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি বিশ্বের আকৃতির কথা নির্ভুলভাবে জানতেন। অথচ এখানে তিনি যেসব কথা বলেছেন তা আজব ও আশ্চর্য হবার মতো। এথেকে দেখা যায়, মাঝে মাঝে তিনি ব্রাহ্মণদের পক্ষ নিতেন। তিনি তো তাদের সম্প্রদায়েরই একজন। তাই তাদের থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু তাকে দোষ দেয়া যায় না। এসত্ত্বেও তিনি সত্যকে বলিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ছিলেন, স্পষ্টভাবেই সত্যকে প্রকাশ ক'রে গেছেন।" ঠিক বরাহমিহিরের মতোই অলবেরুনী সত্যকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করেছেন। বহু অপ্রিয় সত্যকে সাহসের সঙ্গে প্রকাশ ক'রে গেছেন। হিন্দুদের সমালোচনা করার পরক্ষণেই মুসলমান পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'এরকম দোষত্রুটি অন্যান্য জাতির মধ্যেও রয়েছে'—অর্থাৎ, একটি জাতি হিসাবে তোমার মধ্যেও এরকম দোষত্রুটি রয়েছে, সুতরাং তোমার বিশেষ উল্লাস বোধ করার কারণ নেই।

অলবেরুনী হিন্দু ধর্ম, দর্শন, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি নিয়ে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা করলেও, হিন্দু ধর্মের মন ও আত্মাকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তার ঐতিহাসিক স্বরূপ ও ক্রমবিবর্তন ধারাটিও তার কাছে ধরা পড়েনি। তাই, হিন্দুরা অন্যকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করে না দেখে তিনি অবাক হয়েছেন। ধর্মীয় প্রথা, সামাজিক প্রথা ও আইনের বদল ও সংস্কার হতে পারে জেনে বিস্ময় বোধ করেছেন। হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মের মতো সংগঠিত ধর্ম-

মতবাদ নয়। এটি ভারতবর্ষ নামের একটি বিশেষ ভূখণ্ড মধ্যে বাস করা মানবগোষ্ঠীর জীবন-চর্যা ও সংস্কৃতি। বাইরে থেকে আসা ও এখানে আদি থেকে থাকা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ও ধর্মসম্প্রদায়ের জীবনচর্যা ও সংস্কৃতি ক্রমবিবর্তনের পথে মিলেমিশে এক বিশেষ রূপ নিয়েছে। বৈদিক জীবনচর্যা ও সংস্কৃতি আর দ্রাবিড় জীবনচর্যা ও সংস্কৃতি এর দুই প্রধান অংশীদার। যারা এর ধারাস্রোতে লীন হতে চেয়েছে তারা একে আপনা থেকে অনুসরণ ক'রে ধীরে ধীরে এর সাথে এক হয়ে গেছে। আবার যারা স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে চেয়েছে তাদেরও বাধা দেয়া হয়নি। তাই, ভারতবর্ষের বহু আদিবাসী মানবগোষ্ঠী এখনো তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে। তাই, জোর ক'রে ধর্মান্তর হিন্দুদের কাছে সর্বদাই ঘৃণার বিষয়, বর্বরতার লক্ষণ। ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস জানার সুযোগ অলবেরুনীর অবশ্যই ছিল না। কিন্তু, তিনি যদি বেদ থেকে শুরু ক'রে ধারাবাহিক ভাবে ধর্মীয় শাস্ত্রগুলি পাঠ ও অনুধাবন করতেন, তাহলে বিষয়টি তার কাছে বহুলাংশে পরিস্ফুট হতো। কিন্তু, তিনি বিক্ষিপ্তভাবে অল্প-কতক বই পড়ে হিন্দু জীবন-চর্যা ও সংস্কৃতিকে বিচারের দুঃসাহস করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিচারক হবার চেষ্টা না ক'রে সাংবাদিকের ভূমিকা নিলেই বোধ হয় ভালো করতেন।

যেরূপ বিরুদ্ধ পরিবেশে সীমিত সুযোগসুবিধা মধ্যে অলবেরুনী তার ভারত-অধ্যয়ন চালান তাতে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে পারা যায় না। তিনি ভারতের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে যথাসাধ্য জানবার চেষ্টা করেছেন, যতটুকু জেনেছেন তা পাঠককে উপহার দিয়েছেন। হিন্দুদের যে বিষয়গুলি তার খারাপ লেগেছে তা যেমন খোলাখুলি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন, তেমনি যা ভালো লেগেছে তার প্রশংসা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি।

এক ঃ

ভারতচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা করে নেয়া প্রয়োজন। বিষয়টি হলো ঃ কেন একজন ভারতীয়ের মৌলিক চরিত্র বুঝে ওঠা আমাদের পক্ষে এতো কষ্টকর হয়ে পড়ে। অসুবিধা সম্পর্কে সঠিক ধারণা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আমাদের দোষ ক্রটির জবাবদিহি রূপে কাজ দেবে। পাঠকদের সব সময়ে এ কথাটি মনে রাখা দরকার যে হিন্দুরা প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। তাদের যে সব দিক আমাদের কাছে জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হয় সেগুলি বুঝে ওঠা অতি সহজ হয়ে যেতো যদি তাদের ও আমাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ থাকতো। যে প্রতিবন্ধকতা মুসলমান ও হিন্দুদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তার কারণ বহু।

এক ঃ যে সব বিষয়ে অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য রয়েছে সে সব বিষয়ে তাদের সঙ্গেও আমাদের পার্থক্য বর্তমান। প্রথমেই আমি ভাষার কথা বলবো। এ প্রতিবন্ধকতা অন্যান্য জাতির মধ্যেও বর্তমান। যদি এই বাধা জয় করতে আপনি এগিয়ে যান, দেখতে পাবেন কাজটি আদপেই সহজ নয়। কেননা, ভাষাটির পরিধি অতি ব্যাপক। শব্দ ও তার পদ-নিষ্পন্ন বিধি—উভয় ক্ষেত্রেই। অনেকটা আরবী ভাষার মতো। একই বস্তুর অসংখ্য নাম—মূল ও নিষ্পন্ন—দু রকমের। আবার একই শব্দের বহু অর্থ। শব্দটিকে কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা বুঝতে হবে বিভিন্ন বিশেষণের সাহায্যে। কোন লোকের পক্ষেই একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে সঠিক অর্থটি বেছে নেয়া সম্ভব নয় যদি সে বুঝতে না পারে যে কোন প্রসঙ্গে এটি বলা হচ্ছে এবং এর সঙ্গে বাক্যের আগের ও পরের অংশের কী সম্পর্ক। অন্যান্য

জাতির মতো হিন্দুরাও তাদের ভাষার এই ব্যাপকতা নিয়ে গর্ব করে। কিন্তু আসলে এটি হলো ভাষার একটি ক্রুটি।

ভাষাটি আবার দুটি শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। এক: কথ্য ভাষা—দেশের সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে। দুই: সাধু ভাষা—দেশের উপর মহলের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ভাষা ব্যবহার করেন। এ ভাষাকে চেষ্টা ও যত্ন করে যথেষ্ট উন্নত করা হয়েছে। এর শব্দ-প্রয়োগ বিধি ও পদ-নিষ্পন্ন বিধি প্রভৃতি ব্যাকরণের নিয়মাবলীর অধীন। সৌন্দর্য ও অলঙ্কার তত্ত্বের অধীন।

এছাড়া এর ধ্বনিগুলির (ব্যঞ্জন বর্ণ) মধ্যে এমন কতকগুলি ধ্বনি রয়েছে যেগুলি আরবী ও পারসীক ধ্বনির সঙ্গে এক নয় বা কোন রকমের মিল নেই। আমাদের জিভ ও আলজিভ এগুলিকে ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না। আমাদের কান সেগুলি শুনে একই ধরনের অন্যান্য ধ্বনি থেকে তার সূক্ষ্ম পার্থক্য ঠিক করতে পারে না। আবার, আমাদের বর্ণমালায় ওই সব ধ্বনির বর্ণান্তরও সম্ভব নয়। এ কারণে আমাদের লেখার মধ্যে একটি ভারতীয় শব্দকে ব্যক্ত করা কঠিন। কেননা, তা ঠিকমতো করতে হলে, তার উচ্চারণ নির্দেশের জন্য আমাদের বর্ণের বানান নির্দেশের বিন্দু ও চিহ্নগুলির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এ ছাড়া কারক-সূচক অন্ত্যভাগগুলিকে (case endings) প্রচলিত আরবী পদ্ধতিতে অথবা গৃহীত কোন বিশেষ বিধি অনুসারে উচ্চারণ করতে হবে।

এর উপর আবার ভারতীয় লেখাও অতি যত্নহীন। মূল পুঁথির সঙ্গে ভালোভাবে মিলিয়ে নির্ভুল নতুন পুঁথি সংকলনের দিকেও তাদের যত্ন নেই। একজন গ্রন্থকারের উচ্চ-বিকশিত মনের সেরা ফসল এর ফলে নষ্ট হতে বসে। প্রথম বা দ্বিতীয় নকলেই পুঁথি ভুলে ভরাট হয়ে পড়ে, পাঠ পুরোপুরি ভিন্ন বলে মনে হয়। ফলে, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—কোন পণ্ডিত বা সেই বিশেষ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কোন ব্যাক্তি তাকে আর বুঝে উঠতে পারবেন না। পাঠক

বিষয়টিকে স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন নীচের উদাহরণটি থেকে। অনেক সময় কোন এক হিন্দুর মুখ থেকে কোন একটি শব্দ শুনে, বিশেষ যত্নের সঙ্গে তার উচ্চারণ ঠিকমতো রেখে, শব্দটিকে লিখে রাখা হয়েছে। অথচ, পরে যখন সেই শব্দটিই তাদের কাছে বলা হয়েছে তাকে চিনে ওঠা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়েছে।

অপরাপর বিদেশী ভাষার মতো সংস্কৃতেও দুই বা তিনটি ব্যঞ্জন ধ্বনি সংযুক্ত ভাবে থাকতে পারে। পারসীক ব্যাকরণের নিয়মে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন মধ্যে স্বর উহ্য আকারে রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। অথচ সংস্কৃতে অধিকাংশ শব্দ ও নাম এ ধরণের স্বরহীন-ব্যঞ্জন (যুক্তাক্ষর) দ্বারা আরম্ভ হয়। সেজন্য এগুলি উচ্চারণ করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

এছাড়া, হিন্দুদের সকল শাস্ত্রই জনপ্রিয় বিভিন্ন পদ্যছন্দে লেখা। পাছে কোন অংশ বাদ বা যোগ করার ফলে বইগুলি অল্পকাল মধ্যে বিকৃত হয়ে পড়ে তাই তারা তাকে অবিকৃত রাখার একটি উপায় হিসাবে এ পন্থা অনুসরণ করে। আবার, সহজে কণ্ঠস্থ করার সুবিধার জন্যও এটা করা হয়। কারণ, যা লিখিত আকারে না থেকে কণ্ঠস্থ আকারে রয়েছে—তাকেই তারা শাস্ত্রীয় বলে মনে করে। একথা কারো অজানা নয় যে ছন্দোবদ্ধ লেখায় নিছক পাদপূরণের খাতিরে অনেক ধোঁয়াটে ও জটিল পদবিন্যাস ঘটে থাকে। বহু সময়ে জোড়াতালি দিয়ে বা বাগাড়ম্বরের দ্বারা পাদপূরণ করা হয়। এগুলিও একটি কারণ যে জন্য একটি শব্দের অর্থ এক এক সময়ে এক এক রকম।

অতএব, সংস্কৃত সাহিত্য আয়ত্ত করা যে সব কারণে অতি কঠিন, ছন্দোবদ্ধ রচনা পদ্ধতি তার মধ্যে একটি।

দুই: ধর্মের দিক থেকে তারা আমাদের চেয়ে পুরোপুরি ভিন্ন ধরনের। কারণ, আমরা যা বিশ্বাস করি তারা তা করে না,

তারা যা বিশ্বাস করে আমরা তা করি না। ধর্মীয় তত্ত্বকে ঘিরে তাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিভেদ নেই বললেই চলে। এ নিয়ে বড়ো জোর তর্ক-বিতর্ক হয় তাদের মধ্যে, কিন্তু কখনো জীবন-মন বা ধন-সম্পত্তি পণ করে না। তাদের সব কিছু ধর্মীয় উন্মাদনা তাদের ঘিরে যারা তাদের সম্প্রদায় ভুক্ত নয়—অর্থাৎ সমস্ত বিদেশীদের বিরুদ্ধে। তারা তাদের 'ম্লেচ্ছ' বা অপবিত্র বলে। তাদের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করে। তা বিবাহ-ই হোক্ বা একত্র ওঠা বসা, খানাপিনা কিংবা অন্য যে কোন ধরনেরই হোক না কেন। তারা মনে করে যে, এ রকম মেলামেশার ফলে তারা দূষিত হয়ে পড়বে। কোন জিনিষে বিদেশীর জল বা আগুনের ছোঁয়া লাগলে ওই জিনিষটি অশুদ্ধ হয়ে গেছে বলে মনে করে। অথচ কোন সংসারই ওইদুটি ছাড়া চলা সম্ভব নয়। যা একবার দূষিত হয়েছে তাকে শোধন করার জন্য কোনরূপ স্পৃহা তাদের নেই। অথচ সাধারণ নিয়ম অনুসারে, যদি কোন লোক বা কোন প্রাণী অপরিচ্ছন্ন হয়, সে পরিচ্ছন্ন হবার চেষ্টা করে। যারা তাদের ধর্ম-সম্প্রদায় ভুক্ত নয় তাদের তারা সম্প্রদায়ভুক্ত হতেও দেয় না। এমন কি কেউ যদি ওইরূপ ইচ্ছা দেখায় বা তাদের ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয় তাহলেও না। এ সব প্রতিবন্ধকতার ফলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাদের ও আমাদের মধ্যে থাকা ব্যবধানকে সাগর-প্রমাণ করে তোলে।

তিন: চাল-চলন, রীতি-নীতির দিক থেকেও তারা আমাদের থেকে এতো আলাদা যে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের আমাদের পোষাক-আশাক, আচার-আচরণ, রীতি-প্রথা নিয়ে ভয় দেখায়। শয়তান আমাদের জন্ম দিয়েছে এবং যা কিছু ভালো ও ন্যায়সঙ্গত আমাদের কাজকর্ম তার ঠিক উলটো—এ রকম প্রচার করে থাকে। ন্যায়ের খাতিরে এখানে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বিদেশীদের এ রকম ছোট করে দেখা শুধু যে আমাদের ও হিন্দুদের মধ্যেই

চলিত রয়েছে তা নয়। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এ অভ্যাস রয়েছে। এখানে একজন হিন্দুর কথা মনে পড়ছে। আমাদের কৃতকর্মের শাস্তিরূপে সে আমাকে নীচের কাহিনীটি শোনায়:

আমাদের দেশীয় এক শত্রুর আক্রমণের ফলে একজন হিন্দু রাজা নিহত হন। তার মৃত্যুর পর তার একটি পুত্রের জন্ম হয় ও তার উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে। এই পুত্রের নাম সগর। বড়ো হয়ে সে তার মায়ের কাছে পিতা সম্পর্কে জানতে চাইলো। মা তাকে সব ঘটনা তখন বললেন। শুনে সে ঘৃণায় জ্বলে উঠলো। শত্রুর রাজ্য আক্রমণ করে সে মনের সাধ মিটিয়ে প্রতিশোধ নিলো। তারপর হত্যা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে অল্প আর যারা বেঁচে ছিলেন তাদের তিনি তখন আমাদের বর্তমানের এই পোষাক পরতে বাধ্য করলেন—যা কিনা তাদের পক্ষে অতি অসম্মান-সূচক। যখন একথা শুনলাম, তখন এজন্য আমি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম। ভাগ্যিস তিনি আমাদের ভারতীয় করার জন্য বা হিন্দু পোষাক ও চালচলন গ্রহণ করার জন্য বাধ্য না করার মতো যথেষ্ট উদার ছিলেন।

চার: শমণ্যাদের (বৌদ্ধদের) কেন্দ্র করেই হিন্দু ও বিদেশীদের মধ্যে প্রথম বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে। তারা যদিও ব্রাহ্মণদের অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে তাহলেও অন্যান্য যে কোন জাতির চেয়ে তারা এদের অনেক ঘনিষ্ঠ। অতীতে খুরাসান, পারস্য, ইরাক, মোসুল, প্রভৃতি সিরিয়ার সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত দেশগুলি বৌদ্ধ ভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু তারপর, জরাথুস্ত্র আধরবইজান ও বালখ বা বক্ত্র অঞ্চলে মাগিধর্মের প্রচার করলেন। 'তার ধর্ম-মতবাদ রাজা গুস্তাপের সমর্থন পেলো। গুস্তাপের ছেলে ইসফেনদিয়াদ পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে তা প্রচার করলেন। শক্তি প্রয়োগ ও ধর্ম্ম প্রচার দুটি পন্থাই অনুসরণ করলেন তিনি এজন্য। চীনের সীমানা থেকে গ্রীক সাম্রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত আপন সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিনি অগ্নি-মন্দির স্থাপন করেন। পরবর্তী রাজারা তাদের ধর্মকে (জরাথুস্ত্রীয়) পারস্য ও ইরাকের রাষ্ট্র ধর্ম্ম

রূপে ঘোষণা করেন। তার ফলে বৌদ্ধরা সেখান থেকে বিতাড়িত হলো। আশ্রয় নিলো বালখের পূর্বভাগে থাকা দেশগুলিতে। এখনও অনেক মাগিধর্মী ভারতে আছেন। সেখানে তারা মগ নামে পরিচিত। সেই অতীত থেকেই খুরাসান অঞ্চলের দেশগুলির উপর ভারতীয়দের গভীর বিরূপতা রয়ে গেছে। এরপর এলো ইসলাম। পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলো। হিন্দুদের বিরূপতা আরো বাড়তে শুরু করলো যখন তাদের দেশের মধ্যেও মুসলমানদের প্রবেশ আরম্ভ হলো। মুহম্মদ ইবন এলকাশিম ইবন এলমুনব্বিহ সিন্ধু প্রদেশে হাজির হলেন সিজিস্তান (শকস্তান) দিয়ে। বহমানওয়া এবং মূলস্থান জয় করলেন। প্রথমটির নাম দিলেন তিনি অল-মনসুয়া ও অপরটির অল-মমুরা। তিনি ভারতের মূল ভূ-ভাগেও প্রবেশ করেন। গান্ধারের মধ্য দিয়ে কনৌজ পর্যন্ত এগোন। কখনো মুখোমুখি লড়াই ক'রে, কখনো চুক্তির সাহায্যে তিনি স্বার্থসিদ্ধি করেন। কাশ্মীরের সীমানা পথ ধরে অবশেষে ফিরে আসেন। যারা আপনা থেকে মুসলমান হতে চায় তাদের ছাড়া আর সবাইকে তিনি তাদের পুরানো ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে থাকতে দেন। এসব ঘটনা তাদের মনে ঘৃণার গভীর শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে।

সেই থেকে তুর্কীদের সময় পর্যন্ত আর কোন মুসলিম বিজেতা কাবুলের সীমারেখা কিংবা সিন্ধুনদী পার হননি। এ সময়ে তারা (তুর্কীরা) সামনী বংশের অধীনে গজনী অধিকার করেন। প্রধান ক্ষমতা লাভের সুযোগ পেলেন নাসির-অদ্দৌল সবুক্তগীন। তিনি জিহাদ-এর ডাককে নিজের বুলি করে নিলেন। নিজেকে অল-ঘাজী বিশেষণে ভূষিত করলেন। আপন উত্তরাধিকারীদের স্বার্থে ভারত সীমানাকে দুর্বল ক'রে দেবার জন্য বহু রাস্তা তৈরী করালেন। আর, সে সব পথ দিয়ে তিরিশ বছর বা তারও বেশি কাল ধরে যমীন-অদ্দৌল মাহ্‌মুদ ভারতে প্রবেশ করে চললেন। পিতা ও পুত্র দু'জনকেই ভগবান যেন করুণা করেন! মাহ্‌মুদ সে দেশের সমৃদ্ধি

পুরোপুরি নষ্ট করেন। সেখানে বিস্ময়কর লুণ্ঠন চালান। এর ফলে হিন্দুরা ধূলির অণুর মত চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। পুরা-কাহিনীর মতো এ কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

তাদের সেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া অবশেষ প্রত্যেক মুসলমানদের প্রতি ভয়ানক বিরূপ। উপরের ওই ঘটনার ফলে আমাদের অধিকৃত অঞ্চল থেকে হিন্দুশাস্ত্রের সব পুঁথিপত্র অনেক দূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কাশ্মীর, বারানসী, প্রভৃতি এমন অঞ্চলে সেগুলি চলে গেছে যেখানে আমরা এখনো পৌছাতে সক্ষম নই। আর, সে সব অঞ্চলে সকল জাতির বিদেশীদের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক বিরোধিতাকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে ক্রমশঃ বেশি ক'রে তাতিয়ে তোলা হচ্ছে।

পাঁচঃ আরো এমন কতক কারণ আছে যার কথা বললে অনেকটা বিদ্রূপের মতো শোনাবে। এগুলি তাদের জাতীয় চরিত্রের আজব দিক এবং তাদের মধ্যে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। তবে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এ জিনিস দেখা যায়। আমরা শুধু এই কথাই বলতে পারি যে নির্বুদ্ধিতা এমন একটি রোগ যার কোন ওষুধ নেই। হিন্দুরা মনে করে যে তাদের দেশের মতো আর কোন দেশ নেই, তাদের জাতির মতো আর কোন জাতি নেই। নেই তাদের রাজা হেন রাজা, ধর্মের তুল্য ধর্ম, বিজ্ঞান হেন বিজ্ঞান। তারা অসহিষ্ণু, নির্বোধের ন্যায় অহঙ্কারী, আত্ম-অহমিকাপরায়ণ ও গোঁয়ার। প্রকৃতিগত ভাবে তারা যেসব বিদ্যা জানে তার রহস্য অন্যের কাছে ফাঁস করতে মোটে রাজী' নয়। এমনকি নিজেদের জাতির অন্যান্য বর্ণের লোকদের কাছ থেকেও তা তারা অতি সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখে। বিদেশীদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। তারা ভাবে, পৃথিবীতে আর কোন দেশ নেই তাদের দেশটি ছাড়া। অন্য আর কোন জাতির মানুষ নেই তাদের জাতিটি ছাড়া, পৃথিবীতে সৃষ্ট অন্য কোন জীবেরই কোনরকম জ্ঞান বা শাস্ত্র নেই। তাদের অসহিষ্ণুতা এতদূর যে যদি

তুমি তাদের কাছে খুরাসান বা পারস্যের কোন বিজ্ঞান বা পণ্ডিতের কথা বল তাহলে তারা ধরে নেবে যে তুমি মূর্খ ও মিথ্যুক। যদি তারা (অন্যান্য দেশ) ভ্রমণ করতো ও অন্যান্য জাতিগুলির সঙ্গে মেলামেশা করতো তবে অল্পকালের মধ্যে তাদের মনের পরিবর্তন ঘটতো। কেননা, বর্তমানের মতো তাদের পূর্ব-পুরুষেরা কিন্তু এমন সংকীর্ণমনা ছিলেন না। তাদের একজন পূর্ব-পুরুষ, বরাহমিহির একস্থানে ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান দেখানোর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"গ্রীকরা যদিও অপবিত্র, তবু তাদের সম্মান দেখানো উচিত। কারণ, তারা বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষ ও অন্যদের তুলনায় সে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এক্ষেত্রে একজন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে তো কথাই নেই। বিশেষ ক'রে যদি তার পবিত্রতার সঙ্গে শাস্ত্র-দক্ষতাও যোগ হয়।" আগের কালে হিন্দুরা স্বীকার করতেন যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা তারা যতখানি ঘটিয়েছেন সে তুলনায় গ্রীকদের অবদান বেশি। কিন্তু বরাহমিহিরের এ উক্তিটি থেকেই প্রমাণ পাচ্ছেন—অন্যের প্রতি ন্যায়-পরারণতার মনোভাব দেখানো সত্ত্বেও তিনি কী ধরনের আত্মগরিমা প্রচারকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাদের মধ্যে নবাগত হয়ে, তাদের বিশেষ জাতীয়-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও পরম্পরাগত বিজ্ঞানধারার সঙ্গে পরিচয় না থাকার দরুন প্রথমে আমি তাদের জ্যোতির্বিদদের কাছে শিষ্যের মত শিক্ষা সুরু করি। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর আমি তাদের দেখাতে আরম্ভ করলাম যে কোন মৌলিক ভিত্তির উপর এ বিজ্ঞান আধারিত। যুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেবার কতকগুলি নিয়ম দেখলাম। গণিতের নানা রকম বিজ্ঞানানুগ পদ্ধতি দেখিয়ে দিলাম। তারা আশ্চর্য হলো। এরপর আমার কাছ থেকে শেখার আগ্রহ নিয়ে তারা আমার চারপাশে ভিড় জমাতে সুরু করলো। আবার সেই সঙ্গে এ প্রশ্ন করতেও আরম্ভ করলো যে কোন হিন্দু আচার্যের কাছ থেকে এ সব আমি শিখেছি। তখন খোলাখুলি আমি দেখিয়ে দিলাম যে তাদের মূল্য কতটুকু। তাদের সঙ্গে এক স্তরভুক্ত রূপে নিজেকে গণ্য করতে অস্বীকার ক'রে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম,

নিজেকে আমি তাদের চেয়ে অনেক বড় মনে করি। আমাকে তারা একরকম বলতে গেলে যাদুকর বলে মনে করতে লাগলো। তারা তাদের প্রধান ব্যক্তিদের কাছে মাতৃভাষায় আমাকে 'সাগর' বলে অভিহিত করলো—যার অর্থ, সাগরের মতো অথবা সাগরের জলের মতো লবণাক্ত যার তুলনায় সিরকা বা ভিনিগারও মিষ্টি।

ভারতবর্ষে সবকিছুর অবস্থা এখন এ রকম। তাদের বিজ্ঞান-ধারার মধ্যে প্রবেশের পথ সুগম ক'রে তুলতে আমাকে কঠিন বেগ পেতে হলো। অথচ এর প্রতি আমার গভীর অনুরাগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার সময়ে এই অধ্যয়ন ক্ষেত্রে আমিই একক। যে সব অঞ্চলে সংস্কৃত পুঁথি থাকতে পারে বলে মনে হয়েছে সেখান থেকে তা সংগ্রহ করতে যে কোন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে আমি পিছপা হইনি। দ্বিধা করিনি যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে। পিছু হটিনি যে কোন সুদূর প্রান্ত থেকে হিন্দু পণ্ডিত সংগ্রহ করতে যে কিনা প্রয়োজনীয় বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও আমায় শেখাতে পারে। কোন্ গুণীজনের এমন অনুকূল সুযোগ রয়েছে এ বিষয় অধ্যয়ন করার, যেমনটি আমার আছে? ভগবানের অনুকম্পা অপরকে শুধু একটি সুবিধাই দিয়েছে, যা আমার নেই। তা হল, নিজের কাজকর্ম ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে পুরো স্বাধীনতা। নিজের কাজকর্মের ক্ষেত্রে আমার ভাগ্যে কখনো পুরো স্বাধীনতা জোটেনি। যখন যেমন প্রয়োজন সেই মতো প্রভাবিত করা বা আদেশ করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতাও আমাকে দেওয়া হয়নি।

তবু, ভগবান যতখানি সুযোগ আমায় দিয়েছেন সেজন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। তাকেই প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট বলে মেনে নেওয়া উচিত।

খ্রীষ্টান ধর্মের অভ্যুদয়ের আগে পৌত্তলিক গ্রীকদের মধ্যেও হিন্দুদের মতো একই রকমের ধ্যান-ধারণা ছিল। তাদের বিজ্ঞ

ব্যক্তিদের চিন্তাধারা হিন্দু বিদ্বানদের মতোই ছিল। তাদের সাধারণ মানুষেরাও সাধারণ হিন্দুদের মতো একই ধরনের পৌত্তলিক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতো। অতএব, পরস্পর আত্মীয় বলে এরা (অর্থাৎ বিদ্বান সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষ) একই জাতি, এ মতবাদের আমি বিরোধী। তাদের সংশোধন করা আমার এ বিরোধিতার উদ্দেশ্য নয়। যা 'সত্য' নয় (অর্থাৎ মুসলমান ধর্মের ন্যায় একেশ্বরবাদী নয়), তার সংশোধন সমর্থন করা চলে না। সব রকমের পৌত্তলিকতা, তা গ্রীক-ই হোক আর ভারতীয়-ই হোক, অস্থিমজ্জাগত ভাবে এক ও অভিন্ন। সত্য থেকে বিচ্যুতির এ একটি প্রকারমাত্র। গ্রীকদের মধ্যেও এরূপ দার্শনিক ছিলেন যারা সে দেশে বাস করেও বিজ্ঞানের মৌল ভিত্তিগুলি আবিষ্কার করে গেছেন। প্রচলিত অন্ধ ধারণার পরিবর্তে সেসব আবিষ্কারকে নিজেদের কাজে লাগিয়েছিলেন। উপরতলার মানুষদের লক্ষ্যই হলো বিজ্ঞান ভিত্তিক পথ ধরে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অন্য দিকে, সাধারণ মানুষেরা সব সময়েই অন্ধ ধারণা প্রসূত কুস্তি কসরত নিয়ে মেতে থাকে। শাস্তির ভয় দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের দাবিয়ে রাখতে হয়। সক্রেটিসের কথা ভেবে দেখুন। তিনি তার দেশের মানুষদের পৌত্তলিক ধারণার বিরোধিতা করেন। নক্ষত্রদের দেবতা বলে তিনি মেনে নিতে চাননি। এথেনসবাসীদের ১২ জন বিচারকের মধ্যে ১১ জনই একমত হয়ে এজন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। সক্রেটিস সত্যের প্রতি অনুরক্ত থেকে মৃত্যু বরণ করলেন।

হিন্দুদের মধ্যে এ ধরণের সমর্থ ও স্পৃহাবান কোন ব্যক্তি দেখা দেননি যিনি বিজ্ঞানের ধারাকে নির্ভুলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এ কারণে আপনি দেখতে পাবেন যে তাদের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক উপপাদ্যগুলিও অতি বিশৃঙ্খলভাবে বর্তমান। কোনরূপ যৌক্তিক পারম্পর্য নেই তার মধ্যে। আর, চরম দৃষ্টান্তরূপে, সব সময়েই সেগুলি সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রচলিত হাস্যকর ধ্যান-

ধারণার সঙ্গে একাকার ভাবে উপস্থিত। অর্থাৎ, বিরাট বিরাট সংখ্যা, অতি লম্বা লম্বা সময়ের হিসাব আর ধর্মীয় গোঁড়ামি।

তাদের অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন এ নিয়ে কখনো কোন প্রশ্ন তোলে না, সন্দেহ প্রকাশ করে না। সুতরাং হিন্দুদের মধ্যে এটি সর্বজনগৃহীত সুপ্রচলিত প্রথা। আমি তাদের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে যতদূর জানি তাতে বলতে পারি যে তার মধ্যে মুক্তাঝিনুক আর তেঁতুল, কিংবা মুক্তা আর গোবর অথবা মূল্যবান স্ফটিক আর নুড়ি মিলেমিশে রয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে এ দুটিই সমান। কেননা, ত্রুটিশূন্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পদ্ধতি অনুসরণ করতে তারা জানেন না।

দুই :

হিন্দু ধর্ম ও দর্শন

ভারত ও তার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে মূল আলোচনা অলবেরুনী শুরু করেছেন তার বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে। আর তার সূত্রপাত করেছেন হিন্দু-শাস্ত্রাদি অনুসারে ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিয়ে। দ্বিতীয় থেকে অষ্টম এই সাতটি পরিচ্ছেদে তিনি ঈশ্বর, প্রকৃতি ও পুরুষ, ব্যক্ত-অব্যক্ত, আত্মা-পরমাত্মা, ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয়, পতঞ্জলির যোগদর্শন, কপিলের সাংখ্যদর্শন ও গীতার কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, বিশ্বরূপ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এসব সম্পর্কে হিন্দু-তত্ত্ব ও ব্যাখ্যাকে হিন্দুদের ভাষাতেই প্রকাশ করেছেন—যোগদর্শন, সাংখ্যদর্শন, গীতা, বিষ্ণুধর্ম, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে। পাঠককে বিষয়গুলি পরিষ্কার ভাবে বোঝাবার জন্য সমান্তরাল প্রাচীন গ্রীক, আরব ও সুফী দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের বক্তব্যও পাশাপাশি রেখেছেন, বা আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত মতামত যেখানে না দিলে নয় সেসব জায়গা ছাড়া অন্যত্র যতোটা সম্ভব এড়িয়ে গেছেন।

এ আলোচনায় পতঞ্জলির যোগদর্শন এবং বিশেষভাবে গীতার দিকে তিনি বেশ আকৃষ্ট হয়েছেন ও তার তারিফ করেছেন। তার মতে হিন্দু ও গ্রীক দর্শন পরস্পরের কাছাকাছি।

ধর্ম, দর্শন, ঈশ্বর-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই পৃথিবীর মানুষকে তিনি দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন —(১) জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষ (২) অজ্ঞানী সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে তার মতে, এক জাতির মানুষের সঙ্গে আরেক জাতির মানুষের, এক ধর্মের মানুষের সঙ্গে আরেক ধর্মের মানুষের প্রকৃতিগত কোন ভেদ নেই। অলবেরুনীর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আগেই আমরা পেয়েছি। এখানে তিনি তাকে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে

পুরো বইটিতেই তিনি এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে অতি সচেতনতা দেখিয়েছেন। আর এই দিক থেকে হিন্দুধর্মাবলম্বীদেরও তিনি জ্ঞানমার্গী ও প্রচলিত অন্ধ পরম্পরামার্গী – এই দু'ভাগে ভাগ করতে ভোলেননি। এই বিভাগকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : প্রত্যেক জাতির শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের পার্থক্য বর্তমান। প্রথম জন নৈর্ব্যক্তিকতার স্বরূপকে (Abstract Idea) অনুভাবের মধ্যে আনার, তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় জন স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। বিজ্ঞজনেরা যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছান তার শেষ কথাটি জেনেই তারা খুশী থাকে, বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে বা ভাবনার গভীরে প্রবেশ করতে চায় না। বিশেষ ক'রে ধর্ম আর আইনের ব্যাপারে। ...আবার বলেছেন : এবার যদি আমরা শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার দিকে তাকাই তাহলে প্রথমেই আমাদের বলতে হবে যে তারা বিচিত্ররকমে বহুধা বিভক্ত। তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক সরল কথায় ঘৃণা ও অবজ্ঞার যোগ্য। কিন্তু এই ভ্রান্তি অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও রয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য প্রতিটি ধর্মীয় বাক্য অতি যত্নের সঙ্গে শব্দচয়ন ক'রে লেখা উচিত। নিচের দৃষ্টান্তটি সেই শিক্ষাই আমাদের দেয়। কতক হিন্দু পণ্ডিত ভগবানকে 'বিন্দু'রূপে ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। এই উপমার সাহায্যে তারা একথাই বোঝাতে চান যে, ঈশ্বরের উপর কোনরূপ দৈহিক গুণাগুণ আরোপ করা চলে না। কিন্তু, অশিক্ষিত লোক একথা পড়ে মনে করে ঈশ্বর বিন্দুর ন্যায় ক্ষুদ্র। তারা কিছুতেই ধারণা করতে পারে না যে, এই উপমাটির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। তারা শুধুমাত্র এধরনের বেদনাদায়ক সিদ্ধান্তেই থেমে থাকে না, ওই সঙ্গে ঈশ্বরকে আবার সর্ব-বৃহৎ রূপে বর্ণনা করবে, তারপর বলে বসবে যে তিনি লম্বায় বারো আঙুল আর চওড়ায় দশ আঙুল। যিনি সবরকম মাপ ও সংখ্যার ঊর্দ্ধে সেই ঈশ্বরের কী চমৎকার গুণগান।

আবার কোন অশিক্ষিত লোক যদি শোনে যে, আমরা বলাবলি করছি, এ জগতের কোথায় কী ঘটছে সব ঈশ্বর দেখছেন, কিছুই তার কাছে গোপন রাখা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে সে মনে করবে যে এই দর্শন-দৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া। তার ধারণায়, চোখই হলো দেখার একমাত্র মাধ্যম। আর, একটি চোখের চেয়ে দু'টি চোখ নিশ্চয়ই উত্তম। পরিণতিতে সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরকে সে সহস্রাক্ষ বানিয়ে দেবে।

হিন্দুদের মধ্যে যেসব বর্ণের লোকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান বা শাস্ত্রাদি পাঠের অনুমতি নেই তাদের মধ্যেও এই একই রকমের উদ্ভট উদ্ভট আজগুবী ধ্যানধারণা অনেক সময় দেখা যায়।

তিন:

মূর্তি পূজার প্রচলন ও হিন্দু দেব-বিগ্রহ

এরপর অলবেরুনী নবম ও দশম পরিচ্ছেদে হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ বিভাগ, বর্ণ বিভাগের উৎপত্তি নিয়ে পৌরাণিক উপাখ্যান, হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের বিবাহ প্রথা, সন্তান জন্মের জন্য নিয়োগ প্রথা, লৌকিক সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধান কারা রচনা ও প্রবর্তন করেছেন, এক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রীকদের সঙ্গে হিন্দুদের সামঞ্জস্য (অর্থাৎ, উভয় দেশেই এইসব বিধি-বিধানের প্রবর্তক তাদের ঋষিরা) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। হিন্দুদের মধ্যে এককালে প্রচলিত বিচিত্র সামাজিক প্রথার উদাহরণ রূপে মহাভারত থেকে ব্যাসদেব ও পাণ্ডু প্রভৃতির জন্ম ইতিহাস বলেছেন। হিন্দুদের সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় বিধান ও আইন-কানুন পরিবর্তনযোগ্য জেনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

কীভাবে মানুষের মধ্যে মূর্তি পূজার চলন হয়েছে এসম্পর্কে নিজস্ব ধারণার কথা একাদশ পরিচ্ছেদে তিনি ব্যক্ত করেছেন। তার ধারণা, মৃত ব্যক্তির স্মৃতি স্মরণীয় ক'রে রাখার আকাঙ্খা থেকেই মূর্তি তৈরী শুরু হয়। ক্রমে তাথেকেই মূর্তি পূজার বিকাশ ঘটে। হিন্দুদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানিয়েছেন যে, এর প্রচলন প্রধানতঃ অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই সীমিত। যারা উচ্চ শিক্ষিত, যারা প্রকৃত মোক্ষের পথ সন্ধান করেন, যারা দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করেন যারা বিশুদ্ধ সত্যকে খোঁজেন তারা একমাত্র (নিরাকার) ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কারো পূজা-অর্চনা করেন না। তারা স্বপ্নেও কখনো ঈশ্বর রূপে খাড়া করা কোন মূর্তিকে পূজা করার কথা চিন্তা করেন না।

হিন্দুদের মধ্যে কীভাবে মূর্তি পূজার চলন হ'লো তা নিয়ে যে দু'টি কাহিনী তাকে শোনানো হয়েছে তার কথা এরপর তিনি

বলেছেন। এর একটি হলো ইন্দ্র ও অম্বরীষের উপাখ্যান। অন্যটি নারদের উপাখ্যান।

বিষ্ণু অম্বরীষের কাছে যে মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্তি নাকি সেই আদলে গড়া।

অপর উপাখ্যান অনুসারে ব্রহ্মার পুত্র নারদের মনে একমাত্র সাধ ছিল ভগবানকে দর্শন করা। এছাড়া আর কিছুই তার কামনা ছিল না। নারদের একটি লাঠি ছিল। যেখানে তিনি যেতেন সর্বদা এই লাঠিটি নিয়ে যেতেন। মাটিতে ফেলে দিলে এই লাঠিটি সঙ্গে সঙ্গে সাপ হয়ে যেতো। এছাড়াও এটির সাহায্যে তিনি নানা অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারতেন। যাইহোক, ভগবানের দর্শনলাভের জন্য নারদ তপস্যা আরম্ভ করলেন। এই সময়ে একদিন তিনি আগুন (জ্যোতি?) দেখতে পেলেন। আগুনের কাছে নারদ এগিয়ে যেতে তার মধ্য থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠলো: "তুমি যা দেখতে চাইছো তা দেখা অসম্ভব। আমাকে তুমি এরকম ছাড়া অন্য কোন ভাবে দেখতে পাবে না।" নারদ সেদিকে তাকাতে একটি মানুষ আকৃতিতুল্য অগ্নিময় চেহারা দেখতে পেলেন।

এথেকেই উপাস্য দেবতাকে বিশেষ কোন আকৃতিতে কল্পনা ক'রে নিয়ে মূর্তি গড়া ও তার পূজার প্রথা প্রচলিত হয়।

দেবমূর্তি প্রসঙ্গে তারপর তিনি কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিগ্রহ ও দেবমন্দিরের উল্লেখ করেছেন। এর একটি হলো মুলতানের সূর্য বা আদিত্য মূর্তি। এটি কাঠ দিয়ে তৈরী ও লাল রঙের ছাগলের চামড়ায় ঢাকা। মূর্তির দুই চোখে দু'টি মাণিক্য বসানো। মূর্তিটি নাকি শেষ কৃতযুগে তৈরী করা হয়েছিল। যদি ধরে নেয়া যায় যে কৃতযুগের একেবারে শেষে তৈরী হয়েছিল তাহলেও এর বয়স দাঁড়ায় ২১৬, ৪৩২ বছর। মুহম্মদ ইবন আলকাশিম ইবন অলমুনাব্বিহ যখন মুলতান জয় করেন, তিনি খোঁজ নিলেন কী ক'রে এ শহরটি এতো জমজমাট হয়েছে, কোথা থেকে এতো ধনসম্পদ করেছে। তিনি

জানতে পারলেন যে এই বিগ্রহের দৌলতেই এ শহরের এতো রবরবা। চারিদিক থেকে অসংখ্য তীর্থযাত্রী এখানে আসে এই বিগ্রহ দর্শনের জন্য। একথা জানতে পেরে তিনি ঠিক করলেন মূর্তিটি যেখানে যেমন আছে তেমনই থাকুক। তবে, বিদ্রূপ ক'রে তিনি তার গলায় একখণ্ড গরুর মাংস ঝুলিয়ে দিলেন। ওই একই জায়গায় তিনি একটি মসজিদও তৈরী করান"।

এরপর কারমাতীয়রা (Karmatians) মুলতান দখল করলো। দখলকারী জলম ইবন শইবান মূর্তিটিকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেললেন ও মন্দিরের পুরোহিতকে হত্যা করলেন। নিজে থাকার জন্য একটি উঁচু জমির উপর ইঁট দিয়ে একটি কেল্লা বানালেন। নতুন মসজিদও একটি তৈরী হলো। উম্যায়া পরিবারের খলিফা বংশের প্রতি ঘৃণার দরুন পুরানো মসজিদটিকেও বন্ধ ক'রে দিলেন।

ভগবানের দয়ায় আমীর মাহমুদ সেখান থেকে তাদের শাসন উৎখাত করলেন। পুরানো মসজিদটিকে তিনি আবার শুক্রবারের উপাসনাগারে পরিণত করলেন। অন্যটিকে ধ্বংস হওয়ার জন্য কালের হাতে ছেড়ে দেয়া হলো। এখন সেটি একটি গোলাবাড়ি।

কারমাতীয়রা আমাদের চেয়ে একশো বছরের মতো আগে ক্ষমতায় আসে। যদি এই কালকে খেয়ালখুশী মতো বাড়িয়ে ৪৩২ বছর ধরা হয়েছে বলে মেনে নেনই, তাহলেও কৃতযুগের শেষ থেকে হিজরী সনের আরম্ভ ২,১৬.০০০ বছর। একখণ্ড কাঠ কী ক'রে এতো বছর টিঁকে রইলো? বিশেষ ক'রে যেখানকার আবহাওয়া ও মাটি দুইই বেশ আর্দ্র। সেকথা ভগবানই ভালো জানেন!

থানেশ্বর শহরকে হিন্দুরা খুব সম্মান করে। এখানকার বিগ্রহের নাম চক্রস্বামী। এটি ব্রোঞ্জের তৈরী, আর প্রায় একজন মানুষের সমান। এটি এখন গজনীর রঙ্গভূমিতে পড়ে আছে। সঙ্গে রয়েছে সোমনাথ মন্দিরের বিগ্রহটি। এটি মহাদেবের জননেন্দ্রিয়ের মূর্তি,

একে লিঙ্গ বলা হয়। সোমনাথের কথা যথাস্থানে বলবো। চক্রস্বামীর মূর্তিটিকে তার নামের সঙ্গে জড়িত ভারত যুদ্ধের সময়ে তৈরী করা হয়েছিল বলা হয়।

কাশ্মীরের ভিতরে রাজধানী থেকে বোলর পর্বতমালার দিকে দু-তিনদিনের পথ গেলে একটি মন্দিরের দেখা পাওয়া যাবে। এখানে শারদা নামে একটি কাঠের মূর্তি আছে। একে খুব সম্মান করা হয়। অনেক তীর্থযাত্রী সেখানে ভিড় করে।”

এরপর অলবেরুনী তার পাঠকদের হিন্দু বিগ্রহ তৈরীর রীতি ও নিয়ম-কানুন ও তাদের চেহারা বোঝাবার জন্য বৃহৎ-সংহিতা থেকে প্রতিমা নির্মাণ-বিধির পুরো অধ্যায়টি তুলে দিয়েছেন।

চার

বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্র-গ্রন্থ

বেদ কথাটির মানে হলো এরূপ বিষয়ের জ্ঞান যা এর আগে অজানা ছিল। এটি হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ। হিন্দুরা মনে করে যে তারা একে ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন, ব্রহ্মা নিজ মুখে একে ব্যক্ত করেছেন। ব্রাহ্মণেরা মানে না বুঝেও বেদের আবৃত্তি ক'রে থাকেন। একজনের কাছ থেকে শুনে শুনে অন্যজনে তা কণ্ঠস্থ করেন। খুব অল্প হিন্দুই এর অর্থ শেখেন। বেদকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ক'রে, তাকে ব্যাখ্যা করতে পারেন বা সে সম্পর্কে বিতর্কে অংশ নিতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা আরো কম।

ক্ষত্রিয়রা বেদ শিখতে পারেন। কিন্তু, অন্যকে শেখানোর অধিকার তাদের নেই। বৈশ্য ও শূদ্রদের বেদোচ্চারণ দূরের কথা, তাদের শোনার অধিকারও নেই। এ বিধি কেউ লঙ্ঘন করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলে ব্রাহ্মণরা তাকে শাসনকর্তার কাছে টেনে নিয়ে যায় ও শাস্তি হিসাবে তার জিভ কেটে ফেলা হয়।

বেদে সবরকম ধর্মীয় নির্দেশ ও বিধি-নিষেধ ব্যক্ত করা হয়েছে। যেসব কাজ উৎসাহ দানের যোগ্য সেসব কাজের জন্য পুরস্কার, যেসব কাজ নিরোধ করা প্রয়োজন সেসবের জন্য শাস্তির খুঁটি-নাটি বিবরণ রয়েছে। তবে এর বেশির ভাগই দেবতাগণের স্তব-স্তুতি ও বিভিন্ন ধরনের যাগযজ্ঞের বিধি-নিয়ম দিয়ে ভরা। এগুলি বেশ দুর্বোধ্য। আর এতো অগুণতি যে তুমি গুণে তার কূলকিনারা পাবে না।

বেদকে লিখিত রূপ দেয়ার নিয়ম নেই। একে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। লিখিত আকার দিলে তাতে ভুলচুক ঘটতে পারে, ইচ্ছামতো জুড়ে দেয়া বা বাদ দেয়ার ফলে বিকৃত হতে পারে এরকম সব আশঙ্কার দরুন তারা একে লিখিত রূপ দেয় না।… এর ফলে বহুবার তারা বেদ ভুলে গেছে, বেদ বিলুপ্ত হয়ে

গেছে। এনিয়ে তারা শনৌকের একটি বিবরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে থাকেন। শনৌক শুক্রগ্রহের (শুক্রাচার্যের) কাছে বেদ-বিদ্যা লাভ করেছিলেন। এই বিবরণে ভগবান ব্রহ্মাকে বলছেন—"পৃথিবী যখন প্লাবিত হবে তখন তুমি বেদ বিস্মৃত হবে ও তা জলের অতলে ডুবে যাবে। মৎস্য ছাড়া আর কারো পক্ষে তা তুলে আনা সম্ভব হবে না। তাই মৎস্যকে পাঠাব তখন। সে বেদ উদ্ধার ক'রে তোমার হাতে তুলে দেবে। আমি শূকরকে পাঠাব দাঁত দিয়ে তুলে ধরে পৃথিবীকে জলের উপর নিয়ে আসার জন্য।"

হিন্দুরা আরো বলে যে তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বিগত দ্বাপর যুগে পুরো লোপ হয়ে গিয়েছিল। পরাশর পুত্র ব্যাস তা পুনঃ প্রচলন করেন।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মন্বন্তরের শেষে লুপ্ত হয়ে যাওয়া বেদকে নতুন মন্বন্তরের আরম্ভে সপ্তঋষিগণ পুনঃ প্রবর্তন করেন।

এসব কারণে, কিছুকাল আগে বসুক্র নামে একজন খ্যাতনামা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ নিজে থেকে বেদকে লিখিতরূপ দেবার ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি নিজে থেকেই যে কাজে এগিয়ে এসেছেন, অন্য যেকোন লোক তার ভার নিতে ভয়ে কুঁকড়ে যেতো। তিনি এগিয়ে এসেছেন এই কারণে যে, দিন দিন লোকের চরিত্র যেরকম খারাপ হয়ে চলেছে এবং সৎকাজ ও কর্তব্য পালনের স্পৃহা যেভাবে লোপ পাচ্ছে তাতে হয়তো অল্পকাল মধ্যেই লোকে বেদ ভুলে যাবে, মানুষের স্মৃতি থেকে তা পুরোপুরি মুছে যাবে।

বেদের কিছু কিছু সূক্ত আছে যা তাদের মতে ঘরে বসে উচ্চারণ করা অনুচিত। এর ফলে স্ত্রীলোকের ও গাভীর গর্ভপাত হতে পারে। তাই বাইরে বা খোলা মাঠে গিয়ে তারা সেসব সূক্ত উচ্চারণ করে। এমন সূক্ত বিরল যার আবৃত্তি করা নিয়ে এইরকম কোন না কোন বিধি-নিষেধ নেই।

বেদ সাধারণ প্রচলিত ছন্দে লেখা নয়, পুরো ভিন্ন ছন্দে লেখা।

কতক হিন্দু বলেন যে, কোন মানুষের পক্ষে ওরকম ছন্দে লেখা সম্ভব নয়। তবে, হিন্দু পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলে থাকেন, ওরকম ছন্দে লেখা অবশ্যই সম্ভব। তবে, বেদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে ওইরকম ছন্দে লেখা থেকে তারা বিরত থাকেন।

পরম্পরা অনুসারে ব্যাস একে চার ভাগে ভাগ করেছেন—ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ।

পুরাণ কথাটির মানে হলো প্রথম বা চিরন্তন। মোট ১৮ খানি পুরাণ রয়েছে। কোন প্রাণী, মানুষ বা দেবতার নামে এদের নাম রাখা হয়েছে। এর কারণ, এতে তার সম্পর্কে কোন কাহিনী বা এর বিষয়বস্তু মধ্যে কোন না কোনভাবে তার উল্লেখ আছে অথবা এর মধ্যে সে, তার কাছে করা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

পুরাণগুলি মানুষের লেখা। তথাকথিত ঋষিগণ এর রচয়িতা। এই পুরাণগুলির নাম তাদের কাছ থেকে যেমনটি আমি শুনেছি ও তাদের উচ্চারণ শুনে শুনে লিখে রেখেছি তা এইরকম—

১। আদিপুরাণ	২। মৎস্য	৩। কূর্ম	৪। বরাহ
৫। নরসিংহ	৬। বামন	৭। বায়ু	৮। নন্দ
৯। স্কন্দ	১০। আদিত্য	১১। সোম	১২। শাম্ব
১৩। ব্রহ্মাণ্ড	১৪। মার্কণ্ডেয়	১৫। তার্ক্ষ্য	১৬। বিষ্ণু
১৭। ব্রহ্ম	১৮। ভবিষ্য		

এর মধ্যে আমি কেবল মৎস্য, আদিত্য ও বায়ু পুরাণের অংশবিশেষ দেখেছি।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ থেকে আমার কাছে এর চেয়ে কিছু পৃথক একটি তালিকা পড়ে শোনানো হয়েছে। সেটিও এখানে বিশদভাবে দিচ্ছি। কেননা, পরম্পরার ক্ষেত্রে সব সময়েই যতোটা সম্ভব বিশদভাবে খবর দেয়া উচিত।

১। ব্রহ্ম	২। পদ্ম	৩। বিষ্ণু	৪। শিব
৫। ভাগবত	৬। নারদ	৭। মার্কণ্ডেয়	৮। অগ্নি

৯। ভবিষ্য	১০। ব্রহ্মবৈবর্ত	১১। লিঙ্গ	১২। বরাহ
১৩। স্কন্দ	১৪। বামন	১৫। কূর্ম	১৫। মৎস্য
১৭। গরুড়	১৮। ব্রহ্মাণ্ড		

বেদকে ভিত্তি ক'রে স্মৃতির উৎপত্তি হয়েছে। এতে (ধর্মীয়) বিধি-নিষেধাদির বর্ণনা রয়েছে। ব্রহ্মার (প্রজাপতির) এই কুড়িজন পুত্র তার রচয়িতা।

১। আপস্তম্ব	২। পরাশর	৩। শাতভপ	৪। সম্বর্ত
৫। দক্ষ	৬। বশিষ্ঠ	৭। আঙ্গিরস	৮। যম
৯। বিষ্ণু	১০। মনু	১১। যাজ্ঞবল্ক্য	১২। অত্রি
১৩। হারিত	১৪। লিখিত	১৫। শঙ্খ	১৬। গৌতম
১৭। বৃহস্পতি	১৮। কাত্যায়ন	১৯। ব্যাস	২০। উশনা

এছাড়াও হিন্দুদের আরো অনেক বই রয়েছে। ধর্মীয় আচার বিধি, ঈশ্বরতত্ত্ব, সন্ন্যাসী গৌড়ের লেখা ও তার নামে পরিচিত—দেবত্ব ও মোক্ষলাভের উপায় সম্পর্কে বই। দিব্য বিষয়ের উপর লেখা কপিলের সাংখ্য, মোক্ষের সন্ধান ও যোগ মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনের উপর লেখা পতঞ্জলির বই। বেদ ও তার ব্যাখ্যা নিয়ে কপিলের লেখা ন্যায়ভাষা—যাতে বেদ মানুষের লেখা বলে দেখানো হয়েছে ও তার মধ্যে থাকা কোন্ বিধিগুলি সর্বদা পালনীয় ও কোন্‌গুলি বিশেষ অবস্থায় পালনীয় তা দেখানো হয়েছে। এই একই বিষয়ের উপর রয়েছে আবার জৈমিনীর মীমাংসা। প্রত্যেক বিষয়ে অনুসন্ধান ক্ষেত্রে একমাত্র বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করা উচিত. এই বক্তব্যের উপর লেখা বৃহস্পতির লোকায়ত। বুদ্ধি-বিবেচনা ছাড়া পরম্পরাকেও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন একথা দর্শিয়ে লেখা অগস্ত্যের অগস্ত্যমত এবং বিষ্ণুধর্ম। তাছাড়া ব্যাসের ছয় শিষ্য অর্থাৎ—দেবল, শুক্র, ভার্গব, বৃহস্পতি, যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুরও বই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই হিন্দুদের অসংখ্য বই আছে। একজন লোকের পক্ষে

এতো বইয়ের নাম কী ক'রে জানা সম্ভব, বিশেষতঃ সে যদি একজন বিদেশীয় হয় ?

এরপর অলবেরুনী সংক্ষেপে মহাভারতের কাহিনী বলেছেন ও মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে হরিবংশের উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি গীতার উল্লেখ না করলেও এটি যে মহাভারতের অংশবিশেষ একথা অন্য জায়গায় পাঠককে জানিয়ে দিতে তিনি ভোলেননি। মহাভারতের ১৮টি পর্বের তালিকাও দিয়েছেন। রামায়ণের কথা এখানে না হলেও অন্যত্র তিনি বলেছেন। তবে এদুটি তিনি পড়েছেন বলে তার বিবরণ থেকে মনে হয় না।

পরের পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন ব্যাকরণ ও ছন্দের উপর লেখা বইয়ের কথা। ব্যাকরণের উপর তিনি ছ'খানি বইয়ের উল্লেখ করেছেন—ঐন্দ্র, চন্দ্র, শাকট, পাণিনি, সর্ববর্মণের লেখা কাতন্ত্র, শশিদেববৃত্তি, দুর্গাবিবৃত্তি, উগ্রভূতির লেখা শিষ্যহিতবৃত্তি। শেষ বইখানির লেখক উগ্রভূতি শাহ আনন্দপালের শিক্ষক ছিলেন।

'ব্যাকরণের পর অপর একটি বিজ্ঞান হলো ছন্দ। অর্থাৎ, কবিতার বিভিন্ন মাত্রা ও বৃত্ত নিয়ে লেখা আমাদের বইয়ের মতো বই। এবিজ্ঞানটি তাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কেননা, তারা সব বই পদ্যে লেখে।···তারা মোটেই গদ্যে লিখতে চায় না। অথচ গদ্য বোঝা অনেক সহজ।'

পিঙ্গল প্রথম এই কলাটির উদ্ভাবন করেন। এসম্পর্কে অসংখ্য বই রয়েছে। তার মধ্যে সবথেকে নামকরা হলো গৈসিত (? G-AI-S-T); লেখকের নামানুসারে বইখানির নাম। তিনি এতো বিখ্যাত যে, ছন্দকেই তোর নামে অভিহিত করা হয়। অন্য বই হলো পিঙ্গলের লেখা মৃগলাঞ্ছন ও (? U (AU)-L-Y-Ā-N-D)। আমি অবশ্য এর একখানিও দেখিনি। ব্রহ্মসিদ্ধান্তের একটি অধ্যায়েও এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পরের পরিচ্ছেদে (চতুর্দশ) তিনি বলেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষের উপর লেখা বইয়ের কথা।

পাঁচ

হিন্দুশাস্ত্র : জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ

কোন বিজ্ঞান বা কোন চিন্তাধারা যখনই একবার পুরো পৃথিবী জয় করেছে তখন প্রত্যেকটি জাতিই তার শরিক হয়েছে। হিন্দুদের বেলায়ও এর কিছু অন্যথা ঘটেনি। সময়ের চক্রাবর্তন সম্বন্ধীয় তাদের ধারণা খুব একটা নতুন কিছু নয়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ফলাফলের সঙ্গে এর স্বাভাবিক সঙ্গতি রয়েছে।

হিন্দুদের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান সবথেকে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছে। তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধানের সঙ্গে এই শাস্ত্রটি নানাভাবে জড়িত বলেই তার এই খ্যাতি। যদি কোন লোক জ্যোতির্বিজ্ঞানী রূপে গণ্য হতে চান তবে, তাকে শুধু বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিক জ্যোতিবিজ্ঞান জানলেই হবে না, ওই সঙ্গে জ্যোতিষও জানতে হবে। মুসলমানদের কাছে যে বইটি সিন্দহিন্দ নামে পরিচিত সেটিকে তারা সিদ্ধান্ত বলে থাকেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি প্রামাণিক বইকে তারা এই নামে অভিহিত করেন। এমনকি যেসব বই আমাদের মতে জীজ (Zij) অর্থাৎ, গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সার-নির্দেশিকার (hand book) পর্যায়েও আসে না—তাকেও। তাদের পাঁচটি সিদ্ধান্ত আছে।

১। লাট রচিত—সূর্য সিদ্ধান্ত।

২। বিষ্ণুচন্দ্র রচিত—বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত (সপ্তর্ষি মণ্ডলের একটি নক্ষত্র থেকে এই নাম)।

৩। পুলিশ রচিত—পুলিশ সিদ্ধান্ত (ইনি খুব সম্ভব আলেক-জেন্দ্রিয়ার সহিত অভিন্ন, সাইন্দ্র শহরের অধিবাসী ছিলেন)।

৪। শ্রীসেন রচিত—রোমক সিদ্ধান্ত। (রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসী থেকে রোমক)।

৫। ব্রহ্মগুপ্ত রচিত—ব্রহ্মসিদ্ধান্ত। (ব্রহ্মগুপ্তের পিতার নাম বিষ্ণু। মুলতান ও অনহিলবার মধ্যবর্তী ভিল্লমাল শহরে জন্ম। এটি শেষোক্ত শহর থেকে ১৬ যোজন দূরে)।

বরাহমিহির একখানি ছোট আকারের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সহায়ক গ্রন্থ (hand book) লিখেছেন। এটির নাম পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা। নাম থেকে মনে হবে যে এতে পাঁচটি সিদ্ধান্তের সার দেয়া হয়েছে। কিন্তু, আসলে তা নয়। আবার অন্য বইগুলি থেকে এটি এমনকিছু ভালো নয় যে একে পাঁচ সিদ্ধান্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। সুতরাং এই নামটি —'সিদ্ধান্তের সংখ্যা পাঁচ' এই ঘটনার অভিব্যক্তি ছাড়া আর কোন তাৎপর্য বহন করে না।

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন : "সিদ্ধান্তের মধ্যে কতকগুলি সূর্য, অন্যরা—ইন্দু, পুলিশ, রোমক, বশিষ্ঠ ও যবন অর্থাৎ গ্রীক। যদিও সিদ্ধান্তের সংখ্যা বহু, কিন্তু, তারা শুধু শব্দ-বিন্যাসের ক্ষেত্রেই পৃথক, বিষয়বস্তুতে পৃথক নয়। যিনি ভালোভাবে এগুলি অধ্যয়ন করবেন, দেখবেন যে পরস্পরের সঙ্গে তারা একমত।"

এখন পর্যন্ত আমি মাত্র দুখানি বই সংগ্রহ করতে পেরেছি। এদুটি হলো পুলিশ ও ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত। আমি এদু'টির অনুবাদ আরম্ভ করেছি, তবে, এখনো শেষ হয়নি।...

যেসব বই সিদ্ধান্তের পর্যায়ে পড়ে না, তাদের প্রধানতঃ বলা হয় তন্ত্র বা করণ।

বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা দুই। একটি লিখেছেন আর্যভট্ট, অন্যটি বলভদ্র। এছাড়া আরেকটি হলো ভানুযশার রসায়নতন্ত্র। একখানি করণ রয়েছে যা তার নামানুসারে অভিহিত। তাছাড়া রয়েছে ব্রহ্মগুপ্তের করণ-খণ্ড-খাদ্যক।

আর্যভট্টের মতবাদের আলোচনা করা হয়েছে ব্রহ্মগুপ্তের করণ-খণ্ড-খাদ্যক বইটিতে। এরপর ব্রহ্মগুপ্ত আরো একটি বই লেখেন—'উত্তর-খণ্ড-খাদ্যক' অর্থাৎ, খণ্ড-খাদ্যকের ব্যাখ্যা। এ বইটির উপর আবার লেখা হয়েছে খণ্ড-খাদ্যক-টিপ্পা। এটি ব্রহ্মগুপ্ত না অন্য কারো লেখা আমি জানিনা। খণ্ড-খাদ্যকে যেসব গণনা দেয়া হয়েছে তার

প্রকৃতি ও কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ বইটিতে। আমার মনে হয় এটি বলভদ্রের লেখা।

এছাড়া বারাণসীর টীকাকার বিজয়নন্দিনের লেখা জ্যোতির্বিজ্ঞানের একখানি সহায়ক গ্রন্থ রয়েছে। নাম—করণ-তিলক। নাগরপুরের অধিবাসী ভদত্তের (মিহদত্ত ?) পুত্র বিত্তেশ্বরের লেখা আর একখানি বই আছে। নাম—করণ-সার। আর একখানি হলো ভানুযশা লিখিত করণ-পর-তিলক। যেরকম আমি শুনেছি সেই অনুসারে এতে রয়েছে—কীভাবে একটি নক্ষত্রের সঠিক অবস্থান থেকে অন্য অন্য নক্ষত্রের অবস্থান নির্ভুলভাবে জানা যায় তার কথা।

কাশ্মীর-বাসী উৎপলের লেখা বই রাহুন্নাকরণ ও করণপাত। সৌদামিনী-করণ নামে আরেকখানি বই আছে। এর লেখক যে কে আমার জানা নেই।

নানা নামে এরকম আরো অনেক বই আছে। যথা—মনুর লেখা মহামানস, টীকা লিখেছেন উৎপল। এ বইটিরই সংক্ষিপ্তসার, লঘু মানস, লিখেছেন দাক্ষিণ দেশবাসী পুঞ্চল (?)। আর্যভট্টের লেখা দশনাভিকা ও আর্যষ্টাশত। লোকানন্দ রচিত—লোকানন্দ। ব্রাহ্মণ ভট্টিলের রচনা—'ভট্টিল'। এ ধরনের বই অসংখ্য।

জ্যোতিষের উপর নিম্নোক্ত লেখকেরা প্রত্যেকে একখানি ক'রে সংহিতা লিখে গেছেন :

মাণ্ডব্য, পরাশর, গর্গ, ব্রহ্মা, বলভদ্র, দিব্যতত্ত্ব ও বরাহমিহির।

সংহিতা মানে---'যাহা সংগ্রহ করা হয়েছে'। প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই এতে কিছু না কিছু আছে। আবহবিদ্যা ভিত্তিতে যাত্রা সম্পর্কে পূর্ব-সতর্কবাণী, বিভিন্ন রাজবংশের ভাগ্যলিপি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী। শুভ-অশুভ বিষয়ের জ্ঞান। হাতের রেখার সাহায্যে ভবিষ্যৎবাণী। স্বপ্নের ব্যাখ্যা। পাখির ওড়া বা ডাক থেকে শুভাশুভ নিরূপণ ইত্যাদি। কারণ, হিন্দু পণ্ডিতেরা এসব বিশ্বাস করেন। হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রথা হলো তাদের সংহিতা মধ্যে আবহতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যাবতীয় তত্ত্ব প্রদান করা।

নিম্নোক্ত লেখকগণের প্রত্যেকে একখানি ক'রে 'জাতক' বা ব্যক্তি-জ্যোতিষ গ্রন্থ লিখে গেছেন—পরাশর, সত্য, মণিত্থ, জীবশর্ম্মন ও গ্রীক-সন্তান ময় (Mau the Greek)।

বরাহমিহির দু'খানি 'জাতক' গ্রন্থ রচনা করেছেন। একখানি ছোট, অন্যটি বড়ো। প্রথমটি আমি আরবীতে অনুবাদ করেছি। বলভদ্র দ্বিতীয় খানির ব্যাখ্যা লিখেছেন। ব্যক্তি জ্যোতিষের উপর হিন্দুদের একখানি বিরাট বই আছে। নাম—সারাবলী। অনেকটা বাজীদাজ (Vazidaj) এর মতো। কল্যাণবর্মা লিখে গেছেন এখানি। তিনি তার বিজ্ঞান চর্চার জন্য উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিলেন। কিন্তু, সমগ্র জ্যোতিষবিজ্ঞান নিয়ে লেখা এর চেয়েও বড়ো আকারের আরেকখানি বই আছে। এটির নাম হলো যবন।

বরাহমিহিরের আরো কয়েকখানি ছোট বই আছে। যথা—ষট্-পঞ্চাশিকা বা জ্যোতিষ সম্পর্কে ৫৬ অধ্যায় ও হোরা-পঞ্চ-গোত্রীয় (?)। শেষেরটিও জ্যোতিষ নিয়ে লেখা।

যোগযাত্রা ও টিকনীযাত্রা বইতে ভ্রমণ বিষয়ক জ্যোতিষ, বিবাহ পটল বইতে বিবাহ সম্বন্ধীয় জ্যোতিষ ও স্থাপত্য-বিদ্যা নিয়ে বই আছে।

পাখিদের উড়ে যাওয়া ও ডাক থেকে শুভ-অশুভ নিরূপণ এবং বইতে সূচ ফুটিয়ে তার সাহায্যে পূর্বাভাষ বিষয়ে শ্রূধব (শ্রোতব্য ?) নামে তিনখানি বই আছে। প্রথম বইখানির লেখক মহাদেব, দ্বিতীয় খানির বিমলবুদ্ধি ও তৃতীয় খানির বঙ্গাল। গূঢ়-মন নামে একই বিষয়ের উপর বুদ্ধ লিখিত একখানি বই আছে। এই বুদ্ধ লাল চীবর পরিহিত সম্প্রদায় বা শমনীয়াদের (বৌদ্ধ ধর্মের) প্রবর্তক। প্রশ্ন গূঢ়-মন বইটি উৎপল রচিত।

এছাড়া আরো হিন্দু পণ্ডিত আছেন যাদের নাম জানি কিন্তু তাদের লেখা কোন বইয়ের নাম জানি না। যেমন—প্রদ্যুম্ন, সংঘিল, দিবাকর, পরেশ্বর, সারস্বত, পীরুবান, দেবকৃতি ও পৃথুদক স্বামীন।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন এখানকার ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ে।

ছয়

লেখার উপকরণ, গণিত, আজব প্রথা ও আচার-ব্যবহার

কণ্ঠস্বর বক্তার চিন্তাধারাকে শ্রোতার নিকট পৌঁছে দিয়েই খালাস। এজন্য এর ক্রিয়াকে ক্ষণস্থায়ী বলা চলে। অতীত ঘটনাধারার বিবরণ শুধু মাত্র কণ্ঠ বা শ্রুতির সাহায্যে উত্তর পুরুষদের কাছে ঠিকমতো জানানো একেবারে অসম্ভব। ঘটনাধারা যদি আরো বেশি প্রাচীন হয় তবে তো কথাই নেই। মানব মনের নতুন আবিষ্কার লেখন-শিল্প এই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলেছে। বাতাস যেমনভাবে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে, লেখাও ঠিক তেমনভাবে খবরকে সবদিকে ছড়িয়ে দেয়। সে যেন মৃতের আত্মার মতো কালের বুকে সঞ্চরণ ক'রে চলে।

প্রাচীন গ্রীকদের মতো হিন্দুরাও চামড়ায় লিখতে অভ্যস্ত নয়। কেন তিনি বই লিখছেন না সক্রেটিসকে একথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : 'আমি জ্ঞানকে মানুষের সজীব হৃদয় থেকে নির্জীব ভেড়ার চামড়ায় পরিণত করি না।' প্রাচীনকালে মুসলমানেরাও চামড়ার উপরে লিখতেন। আমাদের ধর্ম-প্রবর্তকের সঙ্গে খাইবার অঞ্চলের ইহুদী সম্প্রদায়ের যে সন্ধি হয়েছিল ও তিনি কিসরাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা চামড়ার উপরে লেখা হয়। কোরানের নকল-সমূহ হরিণের চামড়ায় লেখা হতো, ঠিক যেমন আজকাল থোরা-র নকল-সমূহ লেখা হয়ে থাকে। কোরানে বলা হয়েছে, "তারা একে করাটী বানিয়েছিল"। কিরতা বা চরতা মিশরে বানানো হয় পাপিরাসের নল দিয়ে। খলিফাদের আদেশনামাগুলি এতে লেখা হ'য়ে পৃথিবীর সব জায়গায় যেতো আমাদের সময়ের কিছুকাল আগেও। চামড়ার তুলনায় পাপিরাসের সুবিধা এই যে এথেকে কোন অক্ষর ঘষে তুলে দিতে বা যোগ করতে পারবেন না, কারণ, তার ফলে এটি নষ্ট হয়ে যাবে। চীন দেশে প্রথম কাগজ তৈরী হয়। চীনা বন্দীরা কাগজ প্রস্তুত প্রণালী সমরখন্দে প্রচলন করেন। তারপর থেকে নানা দেশে এর চল হয়, —যেখানকার যেমন চাহিদা সেই মতো তৈরী হতে থাকে।

হিন্দুদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে খেজুর ও নারকেলের মতো একটি

পাতলা গাছ আছে। এতে আহারযোগ্য ফল জন্মায় ও এক গজের মতো লম্বা পাতা জন্মায়। পাতাগুলি চওড়ায় পাশাপাশি তিন আঙুলের মতো। হিন্দুরা এই পাতাকে তাড়ী (তাল পাতা) বলে ও তার উপর লেখে। এই পাতার মাঝে একটি ক'রে ফুটো করা হয়। তারপর সেই পাতায় লেখা পুঁথির প্রতিটি পাতাকে একটি দড়ির মধ্যে সেই ফুটো দিয়ে ক্রম অনুসারে পর পর সাজিয়ে সেই দড়িটি দিয়ে বেঁধে রাখে।

মধ্য ও উত্তর ভারতের লোকেরা এজন্য তূজ গাছের ছাল ব্যবহার করে। এটি সেই জাতের গাছ যাথেকে ধনুকের আচ্ছাদনী তৈরী করা হয়। একে ভূর্জ বলা হয়ে থাকে। এক গজ লম্বা ও এক বিঘত বা তার কিছু কম চওড়া ক'রে এগুলি কাটা হয় ও বিভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত করা হয়। শক্ত ও মসৃণ করবার জন্য তারা এতে তেল মাখায় ও পালিশ করে। তারপর লেখার জন্য একে ব্যবহার করে। ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় প্রত্যেকটি পাতাকে। একখণ্ড কাপড়ে মুড়ে, পাতার আকারের দুটি ফলকের মধ্যে পুরো বইটিকে বেঁধে রাখা হয়। এই বইগুলিকে তারা পুঁথি বলে। চিঠিপত্র বা অন্য যাকিছু লেখার দরকার হয় তা সবকিছুই তারা ওই তূজ গাছের ছালের উপরে লেখে।

হিন্দুদের বর্ণমালা সম্বন্ধে আগেই বলেছি। এ বর্ণমালা একবার পুরোপুরি অপ্রচলিত ও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামালো না। দেশের লোক নিরক্ষর হয়ে গভীর অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে গেলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। তারপর পরাশর পুত্র ব্যাস ভগবানের প্রেরণা থেকে ৫০ অক্ষরবিশিষ্ট এক বর্ণমালা পুনরাবিষ্কার করেন।

সবথেকে পরিচিত বর্ণমালাকে সিদ্ধমাতৃকা বলা হয়। কাশ্মীরের লোকেরা এর ব্যবহার করে। এজন্য কেউ কেউ মনে করেন যে, কাশ্মীরেই এই বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু বারাণসীতেও এর প্রচলন রয়েছে। এই শহরটি ও কাশ্মীর হিন্দু শাস্ত্র-সমূহের উচ্চ বিদ্যাপীঠ। মধ্যদেশ, যাকে আর্যাবর্তও বলা হয়, সেখানেও এই বর্ণমালার চল রয়েছে।

মালবে অন্য এক প্রকার বর্ণমালার চল রয়েছে। তার নাম হলো নাগর। প্রথমটির সঙ্গে তার পার্থক্য শুধু বর্ণের আকৃতি নিয়ে।

আরো একটি বর্ণমালা রয়েছে যার নাম অর্ধনাগরী। উপরের বর্ণমালা দুটির মিশ্রণ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে বলেই এই নাম। এটি ভাটিয়া ও সিন্ধুর অন্যান্য কতক অঞ্চলে প্রচলিত।

অন্যান্য বর্ণমালার মধ্যে একটি হল মলওয়ারী। মালওয়াশাউ ও দক্ষিণ সিন্ধুর উপকূল অঞ্চলে এর চল রয়েছে। আরেকটি হলো সৈন্ধব—বহমনওয়া বা অলমনসূরায় প্রচলিত। অন্য একটি কর্ণাটক —এটি চলে কর্ণাটক দেশে। সৈন্যদের মধ্যে যারা 'কন্নড়' নামে পরিচিত সেই সব সৈন্যরা এ দেশীয়। অন্ধ্র অপর একটি বর্ণমালা। এটির চলন রয়েছে অন্ধ্রদেশে। দিরওয়ারী (দ্রাবিড়ী) আর একটি। এটি চ'লে থাকে দিরওয়ারী (দ্রাবিড়) দেশে। লারী বর্ণমালার প্রচলন রয়েছে লার দেশে। গৌরী (গৌড়ীয়) বর্ণমালা পূর্বদেশে প্রচলিত। ভৈকশুকী বর্ণমালা পূর্বদেশের উদনপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত। এই শেষেরটি বুদ্ধদেবের বর্ণমালা।

সৃজনের প্রতীক 'ওম্' শব্দটি দিয়ে হিন্দুরা তাদের পুঁথি আরম্ভ করে, ঠিক যেমন আমরা ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে আরম্ভ করি। ইহা বর্ণমালায় ব্যবহৃত কোন অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি নয়। শুধু এই শব্দটিকে বোঝাবার জন্যই বিশিষ্ট এক প্রতীকের কল্পনা করা হয়েছে। এই বিশ্বাস থেকে লোকে এটির ব্যবহার করে যে এটি তাদের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ বয়ে আনবে। আবার এটির দ্বারা ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বের প্রতি বিশ্বাসকেও তারা প্রকাশ ক'রে থাকে।

হিন্দুরা তাদের বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে সংখ্যা লেখার জন্য ব্যবহার করে না। যেরকম আমরা আরবীতে ক'রে থাকি হিব্রু বর্ণমালার সাহায্য নিয়ে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন বিভিন্ন বর্ণমালার চলন রয়েছে ঠিক সেরকম ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যামালারও চলন রয়েছে। আমরা যেসব সংখ্যাচিহ্ন ব্যবহার করে থাকি

সেগুলি হিন্দু সংখ্যাচিহ্নের সর্বোত্তম নিদর্শন থেকে নেওয়া। চিহ্ন ও সংখ্যার কোন দামই নেই যদি না লোকে জানে—তার মানে কী। কাশ্মীরের লোকেরা তাদের পুঁথির পাতাগুলিকে চিহ্নিত করে এমন কতকগুলি চিহ্ন দিয়ে যেগুলিকে ছবি বা চীনা বর্ণ-চিত্রের মত দেখায়। এগুলির মানে অনেক দিনের অভ্যাস দ্বারাই একমাত্র শেখা যেতে পারে। বালির উপর যখন হিসাব করে তখন অবশ্য এগুলি ব্যবহার করে না তারা।

পাটীগণিতের বেলা সকল জাতিই স্বীকার করে যে সংখ্যায় সব রকম ধারাবাহিকতাই দশাত্মক (অর্থাৎ এক, দশ, একশ, হাজার)। অর্থাৎ প্রতিটি পরবর্তী ধাপ পূর্বটির দশগুণ ও পূর্বটি পরবর্তীটির এক-দশমাংশ। ভিন্ন ভাষাভাষী যেসব লোকের সঙ্গে এ পর্যন্ত আমার যোগাযোগ হয়েছে তাদের প্রত্যেকের ভাষায় ব্যবহৃত সংখ্যাগণনা আমি জানবার চেষ্টা করেছি। দেখেছি যে কোন জাতিই সংখ্যাগণনায় এক হাজারের উপর যায়নি। আরবরাও তাদের গণনা এক হাজারে শেষ করে। এটি প্রকৃত পক্ষে অতি স্বাভাবিক ও নির্ভুল প্রথা। এ বিষয়ে আমি একটি পৃথক গ্রন্থ লিখেছি।

একমাত্র হিন্দুদের সংখ্যাগণনাই এক হাজারের উপরে। অন্ততঃ পক্ষে তাদের পাটীগণিতের শাস্ত্রীয় বিধি-নিয়ম মতো। হয় তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে একে আবিষ্কার করেছিল, নয়তো বিশেষ কোন শব্দতত্ত্ব থেকে একে লাভ করেছিল ও পরে দুইটি ধারার মিলন ঘটিয়েছিল। তারা ধর্মীয় কারণ থেকে সংখ্যাক্রমের ধারাবাহিকতা অষ্টাদশ ধাপ পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। তাদের ব্যাকরণবিদ্‌গণ এ ব্যাপারে শব্দতত্ত্বের দ্বারা তাদের গণিতবিদ্‌গণকে সাহায্য করেছেন।

এই আঠারোটি ধাপ এইরূপ :—

১। একম্	২। দশম্	৩। শতম্	৪। সহস্রম্
৫। অযুত	৬। লক্ষ	৭। প্রযুত	৮। কোটি
৯। অর্বুদ	১০। পদ্ম	১১। খর্ব	১২। নিখর্ব

১৩। মহাপদ্ম ১৪। শঙ্কু ১৫। সমুদ্র ১৬। মধ্য
১৭। অন্ত্য ১৮। পরার্ধ

কতক হিন্দু বলে থাকেন যে পরার্ধের পর আরো একটি বা উনবিংশ ধাপ রয়েছে। তাকে বলা হয় 'ভূরি' এবং সংখ্যাগণনা এই পর্যন্তই সীমিত। প্রকৃতপক্ষে, গণনার কোন শেষ সীমা ও শেষ সংখ্যা নেই। কেবল মাত্র একটি প্রয়োগ সীমা রয়েছে যাকে পরম্পরাগত ভাবে শেষ সীমা বলে মেনে নেওয়া হয় মাত্র।

হিন্দুরা সংখ্যাচিহ্নগুলিকে গণিতে সেই একই ভাবে ব্যবহার করে ঠিক যেভাবে আমরা করি। এ সম্বন্ধে আমি একটি নিবন্ধ লিখেছি ও তাতে দেখিয়েছি যে হিন্দুরা খুব সম্ভবত এদিকে আমাদের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর।

এবার আমরা হিন্দুদের কতকগুলি অদ্ভুত চাল-চলন ও প্রথার কথা বলবো। কোন বিষয়কে তখনই অভিনব বলে মনে হয় যখন তা কদাচিৎ ঘটে ও তা দেখার সুযোগ আমরা খুব কম পাই। যদি অভিনবত্ব অতি বেশিমাত্রায় থাকে তবে বিষয়টি কৌতূহলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় বা অলৌকিক ঘটনার মতো হয়ে যায়—যার সঙ্গে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের কোন সম্পর্ক নেই। তখন নিজের চোখে তা দেখার সুযোগ না হলে তাকে অবিশ্বাস্য রকমের আজগুবী বা কাল্পনিক বলে মনে হয়। অনেক হিন্দু প্রথা আমাদের দেশের ও সময়ের প্রথা থেকে এরূপ ভিন্ন যে আমাদের কাছে তা সরল কথায় আসুরিক বলে মনে হয়। অনেকে এরূপ মনে করতে পারেন যে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজেদের এরূপ বিপরীত-মুখী করেছে। আমাদের প্রথার সঙ্গে তাদের প্রথার কোন মিলই নেই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ উলটো। যদিবা আমাদের প্রথার সঙ্গে তাদের কোন একটি প্রথার মিল দেখা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তার বিপরীত কোন অর্থ বা তাৎপর্য রয়েছে।

তারা তাদের শরীরের কোন চুল কাটে না। আসলে, গরমের প্রভাব থেকে তারা নগ্নভাবে চলাফেরা করে। আর মাথার চুল না কাটার মূল কারণ হলো সর্দি-গর্মির কবল থেকে আত্মরক্ষা করা।

একটি গুচ্ছের আকারে তারা তাদের গোঁফ রাখে। যৌনাঙ্গের চুল না কাটার কারণ এইরকম। লোকের মনে তারা এরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে চায় যে তা কেটে ফেললে কাম-লিপ্সা জাগে ও ভোগ-বিলাস স্পৃহা পেয়ে বসে। এই কারণে, তাদের মধ্যে যারা তীব্র সহবাস ইচ্ছা অনুভব করে তারা কখনো যৌনাঙ্গের চুল কাটে না।

নখ না কেটে তারা তাদের কুড়েমিকে মহিমান্বিত করে। এগুলি তাদের কোন কাজে বা প্রয়োজনে লাগে না। শুধু আলস্য-সুখে দিন যাপনকালে এগুলি দিয়ে মাথা চুলকায় ও চুলের মধ্যে উকুন হাতড়ে বেড়ায়।

হিন্দুরা একের পর এক একা একা ভোজন করে। গোবরের প্রলেপ-দেওয়া স্থানে তারা একাজ সমাধা করে। ভুক্তাবশেষকে কাজে লাগায় না। যে থালায় ভোজন করে তা মাটির হলে ফেলে দেয় তাকে।

সুপারী, পানের পাতা ও খড়ি (চুন) চিবানোর ফলে তাদের দাঁতগুলি সব লাল।

তারা আহারের আগে মদ্যপান করে ও পরে আহার করে। তারা গরুর মূত্র পান করে কিন্তু তার মাংস খায় না।

তারা একটি কাঠি দিয়ে করতাল (কাসর) বাজায়।

তারা পাজামার পরিবর্তে পাগড়ী ব্যবহার করে। যারা একটু সাজতে চায় তারা দু-আঙ্গুল চওড়া এক টুকরো কম্বল পরেই তুষ্ট। এটি তারা তাদের পাছার উপর দুটি দড়ি দিয়ে বাঁধে। যারা আবার অনেক সাজগোজ পছন্দ করে তারা এতো কাপড় দিয়ে পাজামাটি তৈরী করে যে তা দিয়ে বেশ কয়েকখানা বিছানার চাদর ও ঘোড়ার জিনের নিচের আচ্ছাদন তৈরী করা চলে। এই পাজামায় কোন দৃশ্যমান ফাঁক নেই

এবং এত লম্বা যে পাও দেখা যায় না। যে সুতা দিয়ে এটিকে বাঁধা হয় সেটি থাকে পিছনের দিকে। তাদের শিদার (মাথা, গলা ও বুকের উপর অংশ আচ্ছাদনের পোষাক) ঠিক পাজামার মতোই এবং সেটি বোতাম দিয়ে পিছনের দিকে আটকানো।

তাদের কুরতার ঝুল ডান ও বাঁদিকে ছাঁটা।

যেদিন থেকে পরতে আরম্ভ করে সেদিন থেকে সব সময়ে জুতাকে তারা আঁটো সাঁটো রাখে। চলার আগে পায়ের ডিমের কাছে তাদের দুমড়ে নেওয়া হয়।

হাত মুখ ধোয়ার বেলা তারা পা থেকে সুরু করে ও পরে মুখ ধোয়। স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের আগে তারা স্নান করে নেয়।

উৎসবের দিনে তারা তাদের দেহে সুগন্ধির বদলে গোময় লেপে।

মেয়েদের সাজ-পোশাকের জিনিষ পুরুষেরা পরে। তারা প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করে। কানে দুল, বাহুতে অঙ্গদ, হাতের আঙ্গুলে নাম-মোহর করা আঙটি ও পায়ের আঙ্গুলেও ঐ রকম আঙটি পরে।

মহাদেবের প্রতীকরূপে তারা তার জননেন্দ্রিয়ের পূজা করে।

তারা জিন ছাড়াই ঘোড়ায় চড়ে। যদি জিন লাগান হয় তবে ডানদিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণের বেলায় কেউ তাদের পিছনে ঘোড়ায় চড়ে আসুক এটা পছন্দ করে।

তারা কোমরের ডান দিকে কুঠার ঝোলায়।

একটি সূতার বেষ্টনী পরে তারা। একে যজ্ঞোপবীত বলা হয়। এটি তাদের বাঁ-কাধ থেকে কোমরের ডান দিকে ঝোলানো থাকে।

সব রকম আলাপ-আলোচনা ও জরুরী বিষয়ে তারা স্ত্রীলোকের পরামর্শ নেয়।

যখন কোন সন্তান জন্মে তখন লোকেরা পুরুষটির দিকে মনযোগ দেয়, মহিলাটির প্রতি নয়।

দুটি সন্তানের মধ্যে ছোটটিকে তারা বেশি পছন্দ করে। বিশেষভাবে পূর্ব অঞ্চলের লোকেরা। তারা বলে যে প্রথম সন্তানের

জন্মের পিছনে রয়েছে কামলিপ্সার প্রাধান্য। কিন্তু পরবর্তী সন্তানের ক্ষেত্রে রয়েছে অভিজ্ঞ ও প্রশান্ত মনের সহজ ও স্বাভাবিক প্রকাশ।

করমর্দনের বেলা তারা লোকের হাতের উল্টোদিক জড়িয়ে ধরে।

কারো গৃহে প্রবেশের সময় তারা অনুমতি নেয় না, কিন্তু বিদায়ের বেলা অনুমতি নেয়।

কথাবার্তা বা আলোচনা কালে তারা দুই পা ভাঁজ ক'রে বসে।

থুথু ফেলা, নাক ঝাড়া এসব ব্যাপারে তারা বড়োদের কোনরূপ সমীহ না দেখিয়ে তাদের সামনেই নির্বিবাদে এসব ক'রে থাকে। তাদের সামনে বসে তারা উকুনও মারে।

তারা বাতকর্ম-কে শুভ সংকেত ও হাঁচিকে অশুভ সংকেত বলে মনে করে।

তাঁতীকে তারা অপবিত্র বলে মনে করে। অথচ রক্ত-মোক্ষক ও চর্মকার—যারা অর্থের জন্য মৃত-প্রায় প্রাণীকে জলে ডুবিয়ে বা পুড়িয়ে মারে—তাদের অপবিত্র মনে করে না।

তারা বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের লেখার জন্য কালো ফলক (শ্লেট) ব্যবহার করে। এতে তারা লম্বাদিক বরাবর লিখে থাকে, চওড়া দিকে নয়। একটি সাদা জিনিষ দিয়ে তারা বাঁদিক থেকে ডানদিকে লেখে। সে দৃশ্য দেখলে লোকের মনে হবে কবির এই বয়েৎটি হিন্দুদের লক্ষ্য করেই লেখা ঃ

কত লেখক কাঠকয়লা বরণ কাগজ নিয়ে
সাদা রঙের কালির আঁচড় বসায় কলম দিয়ে।
ঠিক যেন সে দিনকে লেখে কালো রাতের বুকে
বুনছে তাঁতী তাঁত যেন বা পোড়েনকে বাদ রেখে।

তারা তাদের বইয়ের নাম বইয়ের শেষে লেখে, আরম্ভে নয়।

তারা তাদের ভাষায় বিশেষ্যগুলিকে গরীয়ান করে তোলে স্ত্রীলিঙ্গ যুক্ত করে, ঠিক যেমন আরবরা করে থাকে ক্ষুদ্রত্ব বাচকের সাহায্যে।

যদি তাদের কেউ অন্যের হাতে কোন জিনিষ দেয়, সে আশা করে যে এটি তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হবে ; যেভাবে আমরা কুকুরের দিকে কোন জিনিষ ছুঁড়ে দিই।

ছুজন লোক যদি নর্দ (backgammon বা অক্ষক্রীড়া) খেলতে বসে তবে তৃতীয় একজনে তাদের মধ্যে পাশা চালে।

কামোত্তেজনার সময়ে হাতীর গাল বেয়ে যে রসক্ষরণ হয় তাকে তারা পছন্দ করে। অথচ এর গন্ধ অতি বিশ্রী।

দাবা খেলার সময় তারা গজের চাল সোজাসুজি ভাবে দেয়। প্রতিবারে বড়ের মত এক ঘর ক'রে। এছাড়া আবার চার কোণে একবার এক এক ঘর করে চলে, রাণীর মতো। তারা বলে যে এই পাঁচ ঘরই (একটি সোজামুখী ও অন্য চারটি কোণাকুনি ভাবে) হলো গজের স্থান যা সে তার শুঁড় ও চার পা দিয়ে অধিকার করেছে।

তারা দাবা খেলে চারজন একসঙ্গে, একজোড়া পাশা নিয়ে। দাবার ছকের উপর তারা খুঁটিগুলি সাজায় এরকম ক'রে—

(চিত্র দেখুন)

দুর্গ	ঘোড়া	গজ	রাজা			বড়ে	দুর্গ
বড়ে	বড়ে	বড়ে	বড়ে			বড়ে	ঘোড়া
						বড়ে	গজ
						বড়ে	রাজা
রাজা	বড়ে				•		
গজ	বড়ে						
ঘোড়া	বড়ে			বড়ে	বড়ে	বড়ে	বড়ে
দুর্গ	বড়ে			রাজা	গজ	ঘোড়া	দুর্গ

এ ধরনের দাবা খেলা যেহেতু আমাদের অজ্ঞাত সেজন্য এর যতটুকু আমি জানি তা প্রকাশ করছি।

দাবার ছকটিকে ঘিরে চারদিকে চারজন খেলোয়াড় বসে। পরপর তারা পাশা দুটি চালে। পাশার সংখ্যাগুলির মধ্যে ৫ ও ৬ নেই। এক্ষেত্রে পাশা যদি ৫ বা ৬ দেখায়, তবে খেলোয়াড় ৫এর বদলে এক ও ৬এর বদলে চার নেয়।

এখানে রাণীর পরিবর্তে শাহ বা রাজা নামটি ব্যবহৃত হয়।

পাশার এক একটি সংখ্যা অনুসারে যে কোন একটি ঘুঁটিকে মাত্র চালতে পারা যায়।

এক হলে বড়ে বা রাজা। সাধারণ দাবার মতো একই নিয়মে ঘুঁটির চাল দেওয়া হয়। যদি রাজার স্থানত্যাগের প্রয়োজন না হয় তবে বড়েকে চালা যেতে পারে—অন্যথায় রাজাকে।

দুই হলে দুর্গ বা রুখ। এটি কোনাকুনি ভাবে তৃতীয় ঘরে যায়। যেভাবে আমাদের দাবা খেলার গজ চলে, তেমনি ক'রে।

তিন হলে ঘোড়া। এর চলন সাধারণ নিয়ম মতো আড়াই ঘর বা তির্যক তৃতীয় ঘর।

চার হলে গজ। এটি সরলরেখায় চলে। যেমন ক'রে আমাদের দাবার দুর্গ চলে তেমনি—অবশ্য, যদি না এর গতি রুখে দেওয়া হয়ে থাকে। যদি সে রকম অবস্থা হয়—যা বহু সময়ে ঘটে—তবে পাশার দান সে বিপত্তি দূর ক'রে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এর সব থেকে ছোট চাল এক ঘর। সব থেকে বড় চাল ১৫ ঘর। কেননা, বহু সময়ে দেখা যায় যে পাশা দুটো ৪ বা দুটো ৬ বা একটি ৪ ও একটি ৬ দেখিয়াছে। ফলে, এর একটি সংখ্যার দরুন সে হয়তো পুরো ছকটা পার হয়, আবার অন্য সংখ্যাটির জন্য সে ছকের পুরো অন্য দিকে চলে যায়। অবশ্য, তাতে যদি কোনরকম প্রতিবন্ধক না

থাকে। একসঙ্গে এরূপ দুটি সংখ্যার জন্য গজ কোনাকুনি ভাবে ছকের একমাথা থেকে অন্য মাথা যেতে পারে।

প্রতিটি ঘুঁটির বিশেষ এক মূল্য নির্দিষ্ট আছে। সেই অনুসারে খেলোয়াড়েরা বাজীর অর্থ পেয়ে থাকেন। রাজার মূল্য ৫, গজ-৪, ঘোড়া-৩, দুর্গ-২, ও বড়ে-১। যে একটি রাজা খতম করে সে ৫ পায়, দুটি রাজার জন্য ১০, তিনটি রাজার জন্য ১৫। যে জিতেছে তার নিজের রাজা যদি তার কাছে না থাকে তবে এরকম হিসাব। যদি নিজের রাজা টিঁকে থাকে ও অন্য তিনটিকে খতম করে তবে সে ৫৪ পায়। এই মূল্য বীজগণিতের নিয়মে নির্ধারিত নয়। সকলে একমত হয়ে ধার্য করা।

হিন্দুরা আমাদের থেকে পৃথক ও আমাদের তুলনায় উৎকৃষ্ট বলে দাবী করে। আমরাও বিপরীত ভাবে ওই রকম দাবী করি। এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজেই করে নেওয়া যেতে পারে তাদের ছেলেদের উপর এ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে। যে সব হিন্দু ছেলে নতুন নতুন মুসলমান অঞ্চলে আসে তাদের মধ্যে আমি এমন কাউকে দেখিনি যে কিনা নিজেদের রীতিনীতি ভালোভাবে জানে না। তবু সে তার মালিকের জুতোজোড়া উল্টোভাবে রাখে। ডাইনেরটি বাঁয়ে, বাঁয়েরটি ডাইনে। পাট ক'রে রাখতে গিয়ে সে মালিকের পোষাকটিকে উলটিয়ে নিয়ে পাট করবে। গালিচা বিছাতে গিয়ে তার নিচের দিকটিকেই উপরের দিকে পাতবে। এই রকম আরো অনেক কিছু। এর সবটাই হলো হিন্দু প্রকৃতির মধ্যে দেখা দেওয়া সহজাত বিকৃতির নিদর্শন।

যাই হোক, এই সব পৌত্তলিক আচার-আচরণের জন্য কেবল হিন্দুদেরই তিরস্কার করা উচিত নয়। পৌত্তলিক আরবরাও অপরাধ ও অশ্লীলতা৹ করেছেন। তারা ঋতুমতী ও গর্ভবতী নারীর সঙ্গে সহবাস করেছেন। একজন নারীর সঙ্গে একই ঋতুকাল মধ্যে

একাধিক লোক সহবাস করেছেন। তারা অন্যের দ্বারা জাত বা অতিথিদের দ্বারা জাত পুত্রকে গ্রহণ করেছেন। নিজের কন্যার প্রেমিকের পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেছেন। কয়েক রকমের পূজার সময়ে তারা তাদের আঙুল দিয়ে শীষের শব্দ তুলতেন, হাততালি দিতেন। ঘৃণিত ও মৃত পশুর মাংস খেতেন। ইসলাম আরবদের মধ্য থেকে সে সব প্রথা দূর করেছে। ভারতের যে সব অঞ্চলের লোকেরা মুসলমান হয়েছে তাদের মধ্য থেকেও ওইসব (খারাপ হিন্দু) প্রথা দূর করেছে। ভগবানকে এজন্য ধন্যবাদ।

সাত

যাদুকলা ও রসায়ন

যাদুকলা ভুল ধারণা সৃষ্টি করে, এক জিনিষকে অন্য জিনিষ বলে মনে করায়। এ ব্যাখ্যা মেনে নিলে এ ধরনের কার্যকলাপ লোকের মধ্যে বেশ ছড়িয়ে গেছে। সাধারণ লোক যেভাবে একে ব্যাখ্যা করে তা হলো : যা অসম্ভব এমন কিছু সৃষ্টি করা। এ এমন একটি ব্যাপার যা বাস্তবের কোঠায় পড়ে না। যা অসম্ভব তা কখনো সৃষ্টি করা যায় না। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা লোক ঠকানো কৌশল মাত্র। এদিক থেকে বিচার করলে যাদুকলার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই।

আলকেমি যাদুকলারই একটি রকমফের মাত্র। তফাৎ শুধু এইটুকুই যে একে এ নাম দেওয়া হয়নি। কিন্তু, একজন লোক একটুকরো তুলাকে যদি সোনার মতো করে, তাহলে তাকে একটুকরো যাদুকলা ছাড়া আর কী বলবে? এক টুকরো রূপা নিয়ে তাকে যদি সে সোনার মতো করে, তা একই কথা। ফারাক এখানে এইটুকুই যে পরেরটি জানাশোনা উপায় অর্থাৎ রূপাকে গিলটি করা, আর প্রথমটি তা নয়।

হিন্দুদের আলকেমির দিকে তেমন ঝোঁক নেই। তবে, কোন জাতিই এর প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়।……এই কলাটির অনুগামীরা সাধারণতঃ তাদের কার্যকলাপ দলের বাইরে ফাঁস করে না। তাই আমি জানতে পারিনি, হিন্দুরা এ ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে। কোন ধরনের উপাদান এজন্য তারা ব্যবহার ক'রে থাকে—খনিজ, প্রাণীজ অথবা উদ্ভিজ্জ উপাদান। তবে, কঠিন পদার্থকে তাপের সাহায্যে বাষ্পে পরিণত করে পুনরায় তাকে কঠিন করা, পুড়িয়ে ভস্ম করা, বিশ্লেষণ করা, 'তালক' বা পিণ্ড তৈরী করা ইত্যাদি প্রক্রিয়া নিয়ে তাদের আলোচনা করতে শোনা যায়।

এ থেকে মনে হয় যে আলকেমির খনিজ বিভাগের দিকেই তাদের ঝোঁক।

তাদের আলকেমি গোত্রীয় অন্য একটি বিজ্ঞান রয়েছে। এটি পুরোপুরি তাদের নিজস্ব। এর নাম দিয়েছে তারা রসায়ন। এটি এমন একটি কলা যা গাছ-গাছড়া থেকে সংগৃহীত যৌগিক ওষুধ, ওষুধ তৈরীর বিভিন্ন উপাদান ও তার কতকগুলি বিশেষ রূপায়ণ পদ্ধতির মধ্যে সীমিত। এর মৌলিক উপাদানগুলি যেসব রোগী ভালো হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছে তাদেরও নিরাময় করে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে। জরাগ্রস্ত লোক যৌবন ফিরে পায়। তারা যৌবন আরম্ভকালে যে রকমটি ছিল সেই রকম অবস্থায় ফিরে আসে। সাদা চুল কালো হয়, ইন্দ্রিয় ক্ষমতা যৌবনকালের মত সহজ ও স্বাভাবিক হয়। এমন কি সহবাস ক্ষমতাও আবার ফিরে আসে ও দীর্ঘ জীবন লাভ করে। আর, কেনই বা হবে না! আমরা কি আগেই বলিনি যে পতঞ্জলি লিখে গেছেন, মোক্ষলাভের অপর একটি মাধ্যম হলো রসায়ন? একথা শোনার পর কে একে সত্য বলে মেনে নেবে না? মূর্খ আনন্দ উপভোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য লাফ দেবে না? আপন মনের মতো সেরা খাবারগুলো মুখে পুরে এই পরমাশ্চর্য কলাটির গুরুকে সম্মান জানাবে না?

এই কলাটির একজন বিখ্যাত প্রতিনিধি হলেন নাগার্জুন। ইনি সোমনাথের কাছে দৈহক দুর্গের অধিবাসী ছিলেন। এই কলাটিতে তিনি অতি দক্ষতা লাভ করেন ও একখানি বই লেখেন। এ বইখানিতে এ বিষয় নিয়ে লেখা সব বইয়ের সার বর্তমান। বইটি খুব দুর্লভ। ইনি প্রায় ১০০ বছর আগে জীবিত ছিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলে ব্যাদি নামে একজন লোক ছিলেন। তিনি তার যা কিছু সম্পদ ও সমগ্র জীবন এর সাধনায় ব্যয় করেন। বহু ব্যর্থতার পর তিনি আকস্মিকভাবে অদৃশ্য হওয়ার মলম তৈরী করতে সমর্থ হন। মলমের ক্রিয়া পরখ করার জন্য তিনি ও

তার স্ত্রী তা গায়ে মাখলে অদৃশ্য হয়ে যান। বিক্রমাদিত্য লোকমুখে এ ঘটনা শুনে তার সত্যি মিথ্যা যাচাই করার জন্য আসেন। রাজা এলে ব্যাদি তাকে বললেন—হাঁ করো, আমার থুথু তোমার মুখের মধ্যে নাও। রাজা ঘৃণা ও বিরক্তিতে তার কথা মানলেন না। থুথু গিয়ে পড়লো দরজার চৌকাঠের উপর। সঙ্গে সঙ্গে নিচের চৌকাঠটি সোনা হয়ে গেল। ব্যাদি ও তার স্ত্রী যেখানে খুসী উড়ে যেতে পারতেন। এই বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাদি অনেক বই লিখে গেছেন। লোকে বলে তিনি ও তার স্ত্রী আজো জীবিত।

ধার শহর মালবের রাজধানী। এখানকার বর্তমান রাজা ভোজদেব। এই ধার শহরের সরকারী ভবনের সামনে রূপার একটি লম্বা টুকরো আছে। এতে একজন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুলেখ দেখা যায়। এটিকে নিয়ে এরকম এক গল্প চালু আছে :

প্রাচীন কালে একজন লোক এখানকার রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। তার সঙ্গে ছিল এমন সব রসায়ন যা একজন লোককে অমর, বিজয়ী ও অপরাজেয় করে তুলবে। সে যা চাইবে তাই করতে পারবে। তিনি রাজাকে অমর হওয়ার প্রস্তাব দিতে তিনি উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন। এ জন্য অন্য যেসব জিনিস লোকটির আর দরকার তা সব কিছু তাকে জুগিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে লোকটি একটি বিশেষ জায়গায় রাজাকে একা একা তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

লোকটি একটি বিশাল কড়াইতে ক'রে কয়েকদিন ধরে তেল জ্বাল দিয়ে চললো। যখন সেই তেল ঠিকমতো বর্ণ নিলো তখন সে রাজাকে তাতে ঝাঁপ দিতে বললো। রাজা ভয় খেয়ে গেলেন। লোকটি রাজার অবস্থা বুঝতে পেরে বললো—তোমার যদি সাহস নেই তবে আমি ঝাঁপ দিচ্ছি। পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে তুমি আমায় সাহায্য করবে কি? রাজা রাজী হলেন। তখন সে কয়েকটি ওষুধের পুরিয়া বের ক'রে রাজার হাতে দিলেন। কোন অবস্থায়

কোনটির পর কোনটি কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে রাজাকে সব বুঝিয়ে দিলেন। তারপর তিনি নিজে সেই তেলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে তিনি তার মধ্যে একেবারে মিশে গিয়ে মণ্ডে পরিণত হয়ে গেলেন। পরপর নির্দেশ অনুযায়ী রাজা প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে চললেন। যখন সবে একটি ওষুধ আর বাকী আছে হঠাৎ রাজার মনে ভাবনা দেখা দিলো। কথা মতো লোকটি যদি সত্যিই অমর, অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য, যা খুশী তা করার ক্ষমতা পায় তবে তার রাজ্য জুড়ে কী বিপাক দেখা দেবে? ভেবে চিন্তে শেষ ওষুধটি তিনি আর দিলেন না। ফলে, কড়াই যখন ঠাণ্ডা হলো তখন লোকটির মণ্ড হয়ে যাওয়া দেহ ওই রূপার টুকরোটির রূপ নিল।

বল্লভী নগরের রাজা বল্লভকে নিয়েও হিন্দুরা এ রকম একটি গল্প বলে। এই রাজার অব্দটি সম্পর্কে যথাস্থানে বলবো।

একজন সিদ্ধ পুরুষ একটি বিশেষ গাছের খোঁজ ক'রে চলছিলেন। গাছটি ছিল দুধেল রস ঝরায় এমন ধরনের। নাম—তোহর। একদিন ঘুরতে ঘুরতে এক রাখালের সঙ্গে তার দেখা হলো। তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ রকমের তোহর গাছের সে খোঁজ দিতে পারে কিনা যার পাতা ছিঁড়লে দুধের মত রসের বদলে রক্ত ঝরে। রাখালটি বললো, সে জানে। সিদ্ধ পুরুষ তখন তাকে মদ খাবার জন্য কিছু পয়সা দিয়ে সেই গাছ দেখিয়ে দিতে বললেন। রাখাল তাকে সে গাছ দেখিয়ে দিলো। সিদ্ধ পুরুষটি তখন সেই গাছে আগুন লাগালেন ও তার মধ্যে রাখালের কুকুরটিকে ছুঁড়ে দিলেন। রাখালটি ক্ষেপে গিয়ে, কুকুরটিকে যেভাবে ছোঁড়া হয়েছে ওই ভাবে সিদ্ধপুরুষকেও আগুনে ছুঁড়ে দিলেন। আগুন নিভে যাবার পর সে অবাক হয়ে দেখলো যে সেই লোকটি ও কুকুরটি দুই-ই সোনায় পালটে গেছে। সে লোকটিকে ওই ভাবে ফেলে রেখে কুকুরটিকে নিয়ে চলে গেলো।

একজন চাষী ঘটনাক্রমে সেই দৃশ্য দেখে ফেলেছিল। সে ওই

সিদ্ধপুরুষের একটি আঙ্গুল কেটে নিয়ে রঙ্ক নামে এক ফলওয়ালার কাছে চলে গেলো। এই ফলওয়ালা খুব গরীব ছিল বলে সবাই তাকে গরীব বা রঙ্ক বলে ডাকতো। তার আর্থিক অবস্থা তখন খুব খারাপ। যাই হোক, চাষীটি সেই আঙ্গুলটি রঙ্ককে দিয়ে তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করলো। আবার সে যখন সোনায় পালটে যাওয়া সেই সিদ্ধপুরুষের কাছে এলো অবাক হয়ে দেখলো, যে আঙ্গুলটি সে কেটে নিয়েছিল সেখানে নতুন একটি সোনার আঙ্গুল গজিয়েছে। সে দ্বিতীয়বার সেই আঙ্গুলটি কেটে নিয়ে রঙ্কের কাছে গেলো ও তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে জিনিষপত্র কিনলো। রঙ্ক কৌতূহলী হয়ে এবার তাকে জিজ্ঞাসা করলো এ আঙ্গুল কোত্থেকে সে পেয়েছে। চাষীটি বোকার মতো সব কথা তার কাছে খুলে বললো। রঙ্ক তখন একটি শকট নিয়ে গিয়ে সিদ্ধপুরুষের দেহটি তাড়াতাড়ি বাড়ীতে বয়ে আনলো। তারপর, তার দৌলতে সে ধীরে ধীরে পুরো শহরটির মালিক হয়ে উঠলো। এই শহরটির উপর রাজা বল্লভের বিশেষ লোভ ছিল। সে রঙ্কের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে শহরটি কিনে নিতে চাইলো। রঙ্ক রাজী হলো না। রাজ-রোষে পড়ার ভয়ে ভীত হয়ে সে গোপনে অলমনসুরার রাজার কাছে হাজির হলো। তাকে অনেক টাকা ও উপহার সামগ্রী দিয়ে তার কাছে সাহায্য রূপে এক নৌবাহিনী প্রার্থনা করলো। রাজা তাকে সাহায্য করলো। এই নৌবাহিনী নিয়ে এক রাতে আচমকা সে রাজা বল্লভকে আক্রমণ করলো। রাজা ও তার সৈন্য-সামন্ত মেরে ফেলে রাজধানীটিকে ধ্বংস করে দিলো। লোকে বলে, যে সব জায়গা রাতে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে ধ্বংস করা হয়েছে, বল্লভী নগরে এখনো তার সব রকম চিহ্ন রয়েছে।

অজ্ঞ হিন্দু রাজাদের সোনা তৈরী করার লোভের কোন শেষ ছিল না। এজন্য তারা যে কোন কাজ করতে রাজী। কেউ যদি এজন্য তাদের যে কোন সংখ্যার সুন্দর শিশুদের হত্যা করার কথাও

বলতো তারা সেজন্য পিছু হটতো না। অনায়াসে তাদের আগুনে ছুঁড়ে দিতো। যদি এই অমূল্য রসায়ন শাস্ত্রটিকে নিষিদ্ধ ক'রে পৃথিবীর এমন এক সীমানায় পাঠিয়ে দেওয়া যেতো যেখানে কোন লোক তার হদিশ পাবে না, তাহলে ভাল হতো।

তন্ত্রমন্ত্র ও যাদুবিদ্যায় হিন্দুদের গভীর বিশ্বাস রয়েছে। তারা এদিকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট। যে বইতে এসব নিয়ে লেখা আছে সে বইটিকে তারা গরুড়ের লেখা বলে মনে করে। গরুড় হলো নারায়ণের বাহন।

যাদের সাপে কামড়ায় তাদের উপরই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এর উপর তাদের বিশ্বাস যে কী রকম গভীর এই গল্পটি থেকে তার আঁচ পাওয়া যাবে। একজন লোক এটি আমায় শুনিয়েছে। সে বললো যে সাপে কামড়াবার পর তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা একজন লোক জীবন ফিরে পেয়েছে এ ঘটনা সে নিজের চোখে দেখেছে। জীবন ফিরে পেয়ে সে লোক অন্য পাঁচজনের মতোই চলে ফিরে বেড়িয়েছে।

আর একজন লোক আমায় এই গল্পটি বললো :

একজন লোককে সাপে কামড়ায়। তাকে বাঁচাবার জন্য তার উপর তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। ফলে লোকটি প্রাণ ফিরে পেয়ে কথা বললো, নিজের ইচ্ছাপত্র তৈরী করলো, কোথায় সে তার টাকা রেখেছে পরিবারের লোকদের তা দেখিয়ে দিলো, বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে যা কিছু দরকারী খবরাখবর সব বুঝিয়ে শুনিয়ে দিলো। কিন্তু তারপর যখন সে একটি থালার গন্ধ শুকলো সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলো।

যদি কোন লোককে সাপে কামড়ায় ও ধারে পিঠে ওঝা না থাকে তবে হিন্দুদের রীতি হলো তাকে একটি পাতার উপর শুইয়ে ভেলায় ক'রে ভাসিয়ে দেওয়া। পাতাটিতে একটি লেখা থাকে। যে লোক তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা এ লোকটির জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবে ওই লেখায় তার কল্যাণ কামনা করা হয়।

আমার এ সবে বিশ্বাস নেই, তাই এ সব ব্যাপার নিয়ে ঠিক কী মন্তব্য করবো ভেবে পাচ্ছি না। এমন একজন লোক, যে কিনা বাস্তবতার প্রতিও যথেষ্ট কম বিশ্বাসী আর যাদুকরের কলাকৌশলের প্রতি তো কথাই নেই, তিনি একদা আমায় বললেন যে তাকে একবার বিষ খাওয়ানো হয়েছিল ও ওই সময়ে লোক তাকে তন্ত্র-মন্ত্র জানা ওইসব হিন্দুদের কাছে পাঠিয়েছিল। তারা তার সামনে বসে তাদের মন্ত্র গাইলো। তার উপর এর ভাল প্রতিক্রিয়া হতে থাকলো। ক্রমে ক্রমে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই সময়ে তারা তাদের হাত ও একটি পল্লব দিয়ে শূন্যে আঁক কেটে চলছিল।

নিজের চোখে আমি দেখেছি, তারা শিকার করতে গিয়ে হরিণকে হাত দিয়ে ধরে। একজন হিন্দু এতদূর পর্যন্ত বলেছিল, সে হাত দিয়ে না ধরে হরিণটিকে তার আগে আগে পায়ে হাঁটিয়ে সোজাসুজি রান্নাঘর পর্যন্ত নিয়ে আসবে। যতদূর আবিষ্কার করতে পেরেছি তাতে আমার এই রকম ধারণা হয়েছে যে কোন একটি বিশেষ গানের সুরে প্রাণীটিকে খুব ধীরে ধীরে মুগ্ধ ক'রে তুলে এ কাজ করা হয়।

আইবেক্স (বন্য ছাগ বিশেষ) শিকারের সময় আমাদের লোকেরাও এ রকমটি ক'রে থাকে। এরা হরিণের চেয়েও অধিক বন্য। কতা (Kata) পাখি শিকারীরাও রাতে পিতলের পাত নিয়ে একই রকমের বাজনা বারবার বাজিয়ে চলে ও হাত দিয়ে তাদের ধরে। বাজনার গৎ পালটানো হলে পাখীরা চারিদিকে উড়ে পালিয়ে যায়।

এগুলি এমন পদ্ধতি যার সঙ্গে তন্ত্রমন্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই। কড়িকাঠের উপর বা টানা দড়ির উপর বল নিয়ে খেলা দেখানোর জন্য অনেক সময় হিন্দুদের যাদুকর বলে মনে করা হয়। কিন্তু এ ধরনের কৌশল অন্যান্য জাতির মধ্যেও চলিত রয়েছে।

আট

জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যোতিষ

ক]

উনিশ থেকে আশি পর্যন্ত ৬২টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ৫২টিতেই অলবেরুনী প্রধানতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ও জ্যোতিষ ও তার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন। যে দশটি অধ্যায়ে এর ব্যতিক্রম রয়েছে সেগুলির কথা পরে বলবো। এই আলোচনার বেলায়ও হিন্দু পরম্পরাকে তিনি দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। (এক) জ্ঞানমার্গী বা বৈজ্ঞানিক পরম্পরা। এর প্রতিভূ হলেন বরাহমিহির, আর্যভট্ট প্রথম ও দ্বিতীয় ও এদের অনুগামীরা, পুলিশ, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জ্যোতির্বিদগণ। (দুই) ধর্মীয় তথা পৌরাণিক অন্ধ পরম্পরা—যার দ্বারা সাধারণ মানুষের বোধবুদ্ধি ধ্যান-ধারণা আচ্ছন্ন। দুটি পরম্পরাকেই এখানে তিনি পাশাপাশি আলোচনা করেছেন, দুটি থেকেই অসংখ্য উদাহরণ ও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অনেকে কীভাবে দু-নৌকায় পা রেখে চলতে চেয়েছেন তাও দেখিয়েছেন। আবার, এই সব পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত নানা আজব পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিও বলতে ভোলেননি। ভোলেননি কল্প, মন্বন্তর, ধর্মযুগ প্রভৃতির ন্যায় বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করতে।

ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে আলোচনার বেলা বিংশ পরিচ্ছেদে তাকে মতপ্রকাশ করতে দেখা যায়: 'সত্য পুরোপুরি ভাবে আর্যভট্টের অনুগামীদের সপক্ষে। তারা প্রকৃতই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের খুব উঁচু সোপানে উঠেছেন বলে ধারণা হয়। এ কথা প্রাঞ্জল যে ব্রহ্মাণ্ড বলতে *aiθn'ρ*-কেই তার সমগ্র সৃষ্ট উপাদান সহ বোঝানো হয়েছে'।

পুলিশ সম্পর্কে তার উঁচু ধারণার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে এক জায়গায় (৫২ পরিচ্ছেদ) 'বলেছেন—'তবে, এখানে, নকলকারী বা অনুবাদকের ত্রুটি বলেই আমি মনে করি। পুলিশ একজন অতি উঁচু স্তরের পণ্ডিত ছিলেন। তার পক্ষে এ রকম ভুল করা অসম্ভব'।

বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত সম্পর্কে তার ধারণার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে ৫৯ পরিচ্ছেদে বলেছেন: "বরাহমিহিরের যে সব উক্তির সঙ্গে এর আগে আমাদের পরিচয় হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি বিশ্বের আকৃতির কথা নির্ভুলভাবে জানতেন। অথচ এখানে তিনি যে সব কথা বলেছেন তা আজব ও আশ্চর্য হবার মতো। এ থেকে দেখা যায়, মাঝে মাঝে তিনি ব্রাহ্মণদের পক্ষ নিতেন। তিনি তো তাদের সম্প্রদায়েরই একজন। তাই তাদের থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন রাখা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবু তাকে দোষ দেওয়া যায় না। এ সত্ত্বেও তিনি সত্যকে বলিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ছিলেন, স্পষ্ট ভাবেই সত্যকে প্রকাশ করে গেছেন। 'সন্ধি' কাল সম্পর্কে যেসব কথা তিনি বলেছেন তা একবার এখানে মনে করুন। আমরা আগেই তার আলোচনা করেছি।"

"হায়, সবাই যদি তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন। উদাহরণ রূপে, হিন্দুদের সব জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে নিঃসংশয়ে বিশিষ্টতম ব্রহ্মগুপ্তকে দেখুন। তিনিও একজন ব্রাহ্মণ। তিনিও পুরাণে পড়েছেন সূর্য চন্দ্রের চেয়ে নিচে অবস্থিত। তাই 'গ্রহণ'-এর জন্য তাকে গ্রাস করতে অবশ্যই একটি মুণ্ডের (রাহু) দরকার। অতএব তিনি সত্য থেকে পিছিয়ে গেলেন। সেই মিথ্যা (পৌরাণিক) ধারণাকেই শেষ পর্যন্ত সমর্থন করলেন। একে এভাবে সমর্থন না করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল বলে আমি মনে করি না। বরঞ্চ যে ভাবে এ কথা তিনি বলে গেছেন তা থেকে মনে হবে, চরম বিরাগ থেকে তাদের উপহাস করার জন্যই যেন তিনি তা বলেছেন। অথবা মনে হবে, মরণ যার সব চেতনা ছিনিয়ে নিতে চলেছে এমন এক লোক হঠাৎ যেন তার মনের ভারসাম্য হারিয়ে ওই রকম কথা ভুল বকে বসেছে।"

"তবে, আমার মনে হয় ব্রহ্মগুপ্তকে হয়তো সক্রেটিসের মতই কোন এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তাই,

বিশাল জ্ঞান, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও উদ্দীপ্ত যৌবন সত্ত্বেও তিনি এ রকম কথা বলে যেতে বাধ্য হন। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে তিনি ব্রহ্মসিদ্ধান্ত রচনা করেন। যদি আমি যা ভাবছি তাই ঘটে থাকে তবে তার সব দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করছি ও এ নিয়ে আলোচনায় এখানেই দাঁড়ি টানছি।"

উপরোক্ত জ্যোতির্বিদদের সম্পর্কে অলবেরুনীর ধারণা এ সব মন্তব্যের মধ্যেই সুস্পষ্ট।

সূর্য অথবা পৃথিবী কে গতিশীল এ সম্পর্কে হিন্দু ধারণা প্রকাশ করতে গিয়ে ২৬ পরিচ্ছেদে তিনি জানিয়েছেন—"ব্রহ্মগুপ্ত বলেন 'কিছু লোক বলে যে প্রথম গতিটি (পূর্ব থেকে পশ্চিম) মধ্য রেখার গতি নয়, উহা পৃথিবীর গতি। কিন্তু বরাহমিহির তাকে এই বলে খণ্ডন করেছেন যে তা হলে কোন পাখি তার বাসা ছেড়ে পশ্চিম দিকে গেলে আর বাসায় ফিরতে পারতো না। প্রকৃতপক্ষে ঠিক এই কথাই বরাহমিহির বলে গেছেন।"

"ব্রহ্মগুপ্ত তার ওই একই বইয়ের আর এক জায়গায় বলেছেন 'আর্যভট্টের অনুগামীরা এই মত পোষণ করে যে পৃথিবী আবর্তন করে চলেছে ও অন্তরীক্ষ স্থির রয়েছে। লোকেরা এই বলে তাদের মত খণ্ডন করতে চেয়েছে যে তাহলে গাছ পালা পাথরাদি পৃথিবী থেকে খসে যেতো।

'কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত তাদের সঙ্গে একমত হননি। তিনি বলেছেন যে তাদের মতবাদ মতো ওইরকম ঘটা মোটেও অনিবার্য নয়, কেন না, সমস্ত প্রকার ভারী জিনিষই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হয়ে থাকে।"

[খ]

২৫ অধ্যায়ে পুরাণ থেকে নদনদীর বর্ণনা দিতে গিয়ে সেই সঙ্গে নিজের কিছু অভিজ্ঞতার কথাও তিনি জুড়ে দিয়েছেন।

"ভারতের নদীগুলি উত্তর অথবা পূর্বের তুষারাবৃত পর্বতমালা থেকে

র তালিকা

সিন্ধু বা বৈহান্দের নদী	বিয়াস্তা বা জইলাম	চন্দ্রভাগা বা চন্দ্রাহ	লাহোরের পশ্চিমে বিয়াহ	লাহোরের পশ্চিমে ইরাবতী	শতরুদ্র বা শতলদর
সরসত দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সরসত নদী	জৌন	গঙ্গা	সরযূ বা সরওয়া	দেবিক	কুহু
গোমতী	ধুতপাপা	বিশালা	বাহুদাস (!)	কৌশিকী	নিশ্চিরা
গণ্ডকী	লোহিতা	দৃশদ্বতী	তামসা ও অরুণা	পর্নসা	বেদস্মৃতি
বিদাসিনী	চন্দনা	কাবনা	পম্বা	চর্মণবতী	বিদিশা
বেণুমতী	পারিযাত্র পর্বত থেকে জন্ম নিয়ে উজ্জয়িনীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সিপ্রা নদী	করতোয়া	শমাহিন	×	×

জন্ম নিয়েছে। উত্তর ও পূর্বের পর্বতগুলি আসলে একই পর্বতমালার মধ্যে পড়ে। এই পর্বতমালা পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়ে তারপর দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে ও মহাসাগরের কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখানে এর কিছু অংশ সাগর মধ্যেও গিয়ে প্রবেশ করেছে। ওই অঞ্চলকে রামের সেতুবন্ধ বলা হয়। এই পর্বতগুলিতে ঠাণ্ডা ও উত্তাপের বেশ তারতম্য দেখা যায়।

নদীগুলির নাম পূর্ব পৃষ্ঠায় একটি তালিকায় দেখানো হইয়াছে।

কায়াবিশ রাজ্যের সীমানা ঘিরে থাকা পর্বতমালা থেকে বা কাবুল থেকে যে নদী জন্ম নিয়েছে তাকে ঘোরবন্দ বলা হয়। নদীটির অনেক শাখা রয়েছে বলেই এই নাম। অনেকগুলি নদী এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে—

[১] ঘুজক গিরিপথের নদী

[২] পরববান শহরের নিচ দিয়ে প্রবাহিত পন্‌চীর গিরিখাতের নদী

[৩, ৪] শরবত ও সাওয়া নদী—যেটি পরে লনবগা বা লমঘান শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে এবং দ্রুত দুর্গের কাছে ঘোরবন্দ নদীর সঙ্গে মিশেছে।

[৫ ও ৬] নূর ও কীরা নদী।

এই নদীগুলির জলে পুষ্ট হয়ে পুরুষাবর শহরের উলটোদিকে ঘোরবন্দ এক বিশাল নদীর আকার নিয়েছে। পূবতীরে থাকা মহারান থেকে একে পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায় বলে এখানে তার নাম হয়েছে সোঁতা (Ford)। অলকান্দাহার (গান্ধার)-এর রাজধানী বা বৈহান্দের পর বীতুর দুর্গের কাছে এটি সিন্ধুর সঙ্গে মিশেছে।

পশ্চিমতীরের ঝিলম শহরের জন্য ঝিলম নামে পরিচিত বিয়াত্তা নদী ও চন্দ্রাহা নদী জহরাবর থেকে ৫০ মাইল এগিয়ে গিয়ে একসঙ্গে মিশেছে ও মুলতানের পশ্চিম দিয়ে বয়ে গেছে।

বিয়াহ নদী মুলতানের পূবদিক দিয়ে বয়ে গেছে। পরে সে বিয়াত্তা ও চন্দ্রাহার সঙ্গে মিলেছে।

ইরাভ নদী কজ নদীর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বয়ে চলেছে। ভালুল (Bhalul) পর্বতমালার নগরকোট থেকে এটি জন্ম নিয়েছে। তারপর শতলদর (শতদ্রু) নাম নিয়ে পঞ্চম নদীরূপে এগিয়ে গেছে।

এই পাঁচটি নদী মুলতানের নিচে পঞ্চনদ নামে এক জায়গায় গিয়ে মিলেছে ও এক বিরাট প্রবাহের সৃষ্টি করেছে। বন্যার সময়ে কখনো কখনো এতে জল এতো বেড়ে যায় যে ১০ ফারসাকের মতো অঞ্চল ভাসিয়ে দেয় ও গাছের মাথা পর্যন্ত জল দাঁড়িয়ে যায়। এ সময়ে চারিদিক থেকে যে সব ময়লা সে ভাসিয়ে নিয়ে যায় জল নেমে যাবার পর সেগুলি গাছের মাথায় পাখির বাসার মত দেখায়।

সিন্ধুর আরোর শহরের পর এ নদীটিকে মুসলমানেরা শিরহান নদী বলে। এখান থেকে নদীটি ক্রমে আরো চওড়া হয়ে হয়ে সোজা বয়ে চলেছে। জল স্বচ্ছ থেকে আরো স্বচ্ছ হয়েছে। তৈরী করেছে অনেক ব-দ্বীপ। তারপর অনেকগুলি শাখায় ভাগ হয়ে অলমনসুরার মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে দু'জায়গায় সাগরে মিশেছে। প্রথমে লোহরাণী নগরের কাছ দিয়ে। পরে, আরো পূবদিকে চলে গিয়ে কচ্ছ প্রদেশের সিন্ধুসাগর দিয়ে।

[গ]

দেশান্তর বা দ্রাঘিমা নিয়ে আলোচনা কালে তিনি ৩১ পরিচ্ছেদে কতকগুলি স্থানের দ্রাঘিমা দিয়েছেন।

"আমি নিজে হিসাব কষে দেখেছি লাহোর দুর্গের দ্রাঘিমা ৩৪°১০'। লাহোর থেকে কাশ্মীরের রাজধানীর দূরত্ব ৫৬ মাইল। এর অর্ধেকটা অসমতল ও অর্ধেকটা সমতল অঞ্চল। এছাড়া আরো যে সব জায়গার

দ্রাঘিমা পরখ ক'রে দেখার সুযোগ আমি পেয়েছি তার একটি তালিকা এখানে দিলাম।"

ঘজনা (গজনী)	৩৩°৩৫'	লমঘান	৩৪°৪৩'
কাবুল	৩৩°৪৭'	পুরুষাবর	৩৪°৪৪'
কান্দি (রাজার প্রহরা শিবির)	৩৩°৫৫'	বৈহান্দ	৩৪°৩০'
		জইলাম	৩৩°২০'
দুনপুর	৩৪°২০'	নন্দনা দুর্গ	৩২°০'

শেষোক্ত স্থানটি থেকে মুলতানের দূরত্ব প্রায় ২০০ মাইল।

শালকোট	৩২°৫৮'
মান্দাক্কাকোর	৩১°৫০'
মুলতান	২৯°৪০'

"এখানে যে দেশগুলির কথা বলা হলো তার ওপারে এ দেশের (ভারতের) আর কোন অঞ্চলে যাবার সুযোগ আমাদের হয়নি। তাদের পুঁথি-পত্তর থেকেও অন্য কোন দেশের দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের কথা জানতে পারিনি।"

[ঘ]

বিভিন্ন ভারতীয় প্রবাদ নিয়ে আলোচনার বেলা অলবেরুনী এখানে ইয়াজদাজির্দ অব্দের ৪০০ সংবৎকে মাপকাঠি বা নমুনা বছর হিসাবে ধরেছেন।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন বইতে ও পুরাণে যে কল্প, মন্বন্তর ও যুগ গণনার হিসাব রয়েছে, প্রথমে তিনি তার ফিরিস্তি দিয়েছেন। তারপর বলেছেন সেসব অব্দের কথা যেগুলির ব্যবহার লোকের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। এই বর্ণনা আরম্ভ করেছেন তিনি কলৌব্দ বা কলিকাল ও পাণ্ডব কাল দিয়ে।

"কলিযুগের আরম্ভ হওয়ার পর কত বছর পার হয়েছে এ নিয়ে কোন বিরোধ নেই। ব্রহ্মগুপ্ত ও পুলিশ দু'জনের মতেই আমাদের

নমুনা বছর পর্যন্ত ৪১৩২ বছর পার হয়েছে। আর, ভারত যুদ্ধ থেকে পার হয়েছে ৩৪৭৯ বছর। প্রথমটি কলিকাল। দ্বিতীয়টি পাণ্ডব কাল।”

হিন্দুদের আরো একটি অব্দ আছে। এটির নাম কাল-যবন। এটি সম্পর্কে পুরো বিবরণ সংগ্রহ করতে পারিনি। তারা এ'র আরম্ভ কাল নির্দেশ করে শেষ দ্বাপর যুগের শেষভাগে। এই যবন তাদের দেশ ও ধর্মের উপর খুব পীড়ন চালিয়েছিল।

এই সব অব্দ দিয়ে তারিখ দিতে গেলে বিরাট বিরাট সংখ্যা লিখতে হয়। তাই লোকে তার ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে। এর বদলে তারা ব্যবহার করে :

(১) শ্রীহর্ষ সংবৎ (২) বিক্রমাদিত্য সংবৎ (৩) শক-কাল (৪) বল্লভ-কাল (৫) গুপ্ত-কাল

শ্রীহর্ষ সম্পর্কে হিন্দুরা বলে যে মাটির নিচে কোনো সম্পদ লুকানো আছে কিনা তা খুঁজে বার করার জন্য তিনি সপ্তম পৃথিবীর নিচ পর্যন্ত মাটি পরীক্ষা ক'রে দেখতেন। তার ফলে মাটির নিচ থেকে লুকানো সম্পদ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। এজন্য প্রজাগণকে পীড়নের হাত থেকে (কর ইত্যাদি আদায়ের হাত থেকে) অব্যাহতি দিতে পেরে-ছিলেন। তার অব্দটি মথুরায় ও কনৌজ দেশে ব্যবহার করা হয়। শ্রীহর্ষ ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যে ৪০০ বছরের ব্যবধান বলে এখানকার কিছু লোক আমায় বলেছে। কিন্তু কাশ্মীরী পঞ্জিকায় পড়েছি যে শ্রীহর্ষ বিক্রমাদিত্য থেকে ৬৬৪ বছর পরবর্তী ছিলেন। এই মতপার্থক্য আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কোন নির্ভরযোগ্য মহল থেকে খবর সংগ্রহ ক'রে সে সংশয় দূর করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

“দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের লোকেরা বিক্রমাব্দের ব্যবহার করে। এটিকে এই ভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রথমে ৩৪২ কে ৩ দিয়ে গুণ করে তার সঙ্গে ষষ্ট্যাব্দের * যতো বছর পার হয়েছে তাকে যোগ করা

*ষাট বছরের চক্র-সংবৎ

হয়। এই যোগফল চলিত বিক্রমাব্দের সমান। মহাদেবের শ্রুধব বইতে আমি বিক্রমাদিত্যের নাম দেখেছি চন্দ্রবীজ।"

"এই প্রণালীর গণনা সম্পর্কে প্রথমেই বলবো যে এটি বেশ অসুবিধা-জনক ও অস্বাভাবিক। যদি ১০২৬ কে গণনার ভিত্তিরূপ নেয়া হয়—আর তাইতো তারা আসলে করে—তাহলে ৩৪২ এর কোন প্রয়োজন ছাড়াই এ গণনা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ যদি ধরে নেওয়া যায় যে প্রণালীটি ঠিক তাহলে এ প্রণালীর মূল্য ততক্ষণই, যতকাল পর্যন্ত ষষ্ঠ্যাব্দের সংখ্যা মাত্র একটিই থাকবে। যদি অনেক ষষ্ঠ্যাব্দ চালু হয় কী করে গণনা করা হবে?"

"শকাব্দের আরম্ভ বিক্রমাব্দের ১৩৫ বছর পর। সিন্ধুনদ ও মহাসাগরের মধ্যে থাকা দেশগুলির উপর এই শক খুব পীড়ন চালায়। এই অঞ্চলে থাকা আর্যাবর্তে তার রাজধানী ছিল।...অনেকে বলে যে সে অলমনসুরা শহরের একজন শূদ্র। অন্যেরা বলে যে সে একেবারেই হিন্দু ছিল না, পশ্চিম থেকে এদেশে এসেছিল। এর জন্য হিন্দুদের অনেক কষ্ট সইতে হয়। তারপর পূর্বদিক থেকে সাহায্য আসে, রাজা বিক্রমাদিত্য তার বিরুদ্ধে অভিযান ক'রে তাকে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য করেন। তিনি তাকে মুলতান ও লোনী দুর্গের মাঝে করুর অঞ্চলে হত্যা করেন। লোকে এই অত্যাচারীর মৃত্যুতে খুশী হলো। সেই থেকে এই তারিখটি বিখ্যাত হয়ে গেলো ও একটি অব্দের আরম্ভ রূপে গণ্য হতে লাগলো বিশেষ ক'রে এদেশে জ্যোতির্বিদদের কাছে। তারা এই শকরাজার বিজেতাকে তার নামের আগে শ্রী যোগ করে সম্মান দেখিয়ে থাকে—অর্থাৎ শ্রীবিক্রমাদিত্য বলে উল্লেখ করে। কিন্তু বিক্রমাদিত্য সংবৎ ও শক-নিধন মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। তাই মনে হয়, বিক্রমাব্দের বিক্রমাদিত্য ও শক-নিধনকারী বিক্রমাদিত্য এক লোক নন।"

"বল্লভী শহরের রাজা বল্লভ থেকে বল্লভ-সংবতের চলন হয়েছে। এ শহরটি অনহিলবার থেকে ৩০ যোজনের মতো দূরে। অব্দটির আরম্ভ

শকাব্দ থেকে ২৪১ বৎসর পর। লোকেরা এটিকে এভাবে লেখে: প্রথমে তারা শক-বছরটি বসায়, তারপর তা থেকে ছয়ের ঘনমূল (৬×৬×৬=২১৬) ও পাঁচের বর্গমূল (৫×৫=২৫) বিয়োগ করে (২১৬+২৫=২৪১ বিয়োগ করে)। বিয়োগ ফল চলিত বল্লভ-সংবৎ। বল্লভের ইতিহাস যথাস্থানে বলা হয়েছে।"

"লোকে বলে যে গুপ্তরা দুষ্ট প্রকৃতির পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাদের বিনাশ তারিখ থেকে গুপ্তাব্দের গণনা করা হয়। এ থেকে মনে হয় বল্লভ তাদের শেষ রাজা ছিলেন। কেননা বল্লভ ও গুপ্ত সংবৎ, দুটিই আরম্ভ হয়েছে শকাব্দের ২৪১ বছর পর থেকে।"

"জ্যোতির্বিদদের অব্দটি শক-কাল থেকে ৫৮৭ বছর পরে সুরু হয়েছে। মুসলমানদের কাছে যে বইটি অল-অরকন্দ নামে পরিচিত ব্রহ্মগুপ্তের সেই খণ্ড-খাদ্যক ভিত্তিতে এটি প্রচলিত।"

ইয়াজদাজির্দ-এর ৪০০ সংবৎকে আমরা মাপকাঠি হিসাবে নিয়েছি। এ বছরটি বিভিন্ন ভারতীয় অব্দ অনুসারে যথাক্রমে এইরূপ:

১।	শ্রীহর্ষ সংবতের	১৪৮৮ বছর
২।	বিক্রম সংবতের	১০৮৮ বছর
৩।	শক-কালের	৯৫৩ বছর
৪।	বল্লভ ও গুপ্ত-কালের	৭১২ বছর
৫।	খণ্ড-খাদ্যকের	৩৬৬ বছর
৬।	বরাহ মিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকার	৫২৬ বছর
৭।	করণসারের	১৩২ বছর
৮।	করণ তিলকের	৬৫ বছর

উপরের শাস্ত্রগ্রন্থ ক'টিতে অব্দগুলি ওই ওই লেখকদের মতে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গণনায় মূলবিন্দু ধরে হিসাব করা সুবিধাজনক। এই সব তারিখ যে সময় ওই সব লোক জীবিত ছিলেন বোধহয় তার মধ্যে পড়ে। এমনও অবশ্য হতে পারে যে ও তারিখগুলি তাদের জীবিতকাল থেকে আগের।

ভারতের সাধারণ লোকেরা একটি শতাত্মক অব্দের ভিত্তিতে সাধারণতঃ তারিখ লেখে। এর বছরগুলিকে এরা সংবৎসর বলে। ১০০ বছর পুর্ণ হলে তাকে বাদ দিয়ে আবার নতুন করে গণনা সুরু করে। একে লোককাল বলা হয়। কিন্তু এটি সম্পর্কে লোকে এত ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে যে তা থেকে কোন সত্য বার করার উপায় নেই। বছরের আরম্ভ নিয়েও এ রকম তাদের নিজেদের মধ্যে মত-বিরোধ আছে।

যে সব জ্যোতির্বিদ শককাল ব্যবহার করে, তারা বছরের আরম্ভ চৈত্র থেকে ধরে। সেক্ষেত্রে কনিরের অধিবাসীরা গণনা করে ভাদ্র মাস থেকে। কনির ও কাশ্মীর এক। এরা আমাদের নমুনা বছরটিকে এদের একটি অব্দের ৮৪ সংবৎ বলে ধরে।

বরদরী ও মারীগল মধ্যে যারা থাকে তারা বছরের আরম্ভ কার্তিক মাস থেকে ধরে। নমুনা বছরটিকে তারা তাদের একটি অব্দের ১১০ সংবৎ বলে। কাশ্মীরীয় পঞ্জিকাটির গণনাকারী বলেন যে আগামী বছরটি শতাত্মক অব্দের (লোককাল) এক নতুন শতকের ষষ্ঠ বছর। কাশ্মীরের লোকের মধ্যে প্রচলিত এই গণনা মতো অবশ্য তাই-ই হবার কথা।

মারীগলের পরে, একেবারে তাকেশ্বরের শেষসীমা অবধি নীরহর দেশে ও লোহাবরে মার্গশীষ থেকে বছর ধরে। নমুনা বছরটি তাদের একটি অব্দের ১০৮ সংবৎ। লনবগের লোকেরা তাদের মতকেই অনুসরণ করে। মুলতানের লোকেরা আমায় বলেছে যে মার্গশীষের

অমাবস্যা থেকে বছর গোণা সিন্ধু ও কনৌজের লোকদের বৈশিষ্ট্য। মুলতানের লোকেরা কয়েক বছর হলো সে প্রথা ছেড়ে কাশ্মীরী প্রথা ধরেছে। কাশ্মীরী প্রথায় চৈত্র অমাবস্যা থেকে বছরের আরম্ভ।

তারা কীভাবে সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসকাল ৪১৬ হিজরী বা ৯৪৭ শকাব্দ গণনা করে সেই স্থূল পদ্ধতিটি আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। প্রথমে তারা ২৪২ সংখ্যাটি লেখে। পরে তার নিচে ৬০৬ সংখ্যাটি বসায়। তার নিচে আবার ৯৯ সংখ্যাটি। এগুলি যোগ করলে ৯৪৭ বা শককালের তারিখটি পাওয়া যায়।

ওই তারিখ গণনা করার রীতি যে অমনিই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মুলতানের বাসিন্দা দুর্লভের লেখা এক পুঁথির একটি পাতা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেখানে লেখক বলেছেন: প্রথমে ৮৪৮ লেখ, তারপর তার সঙ্গে লোককাল যোগ কর, তাহলেই শককালের তারিখটি পাবে।

আমাদের নমুনা বছরটি যত শককালের সমান সেই ৯৫৩ থেকে যদি ৮৪৮ বিয়োগ করি তবে অবশিষ্ট থাকে ১০৫ আর এই সংখ্যাটি লৌকিক-কালের সমান। আর এ ক্ষেত্রে সোমনাথের ধ্বংস কাল ৯৮ লোক-কাল।

হিন্দুদের এক শাসক-বংশ তুর্কীদের কাবুলে বাস করতেন। তারা তিব্বতী ছিলেন বলা হয়। তাদের প্রতিষ্ঠাতা বরহতকীন সেখান থেকে প্রথম এখানে আসেন। তিনি কাবুলের শাহিয়া উপাধি নিয়ে রাজত্ব করেন। তার বংশধরেরা বহু পুরুষ ধরে রাজত্ব ক'রে চলেন। এদের সংখ্যা প্রায় ৬০ জন বলা হয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হিন্দুরা কোন কিছুর ঐতিহাসিক কালক্রমের দিকে নজর দেয় না। তারা তাদের রাজাদের ক্রমপঞ্জী রক্ষার দিকে অতি অমনযোগী। খবরের জন্য তাদের উপর চাপ দিলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। কী বলবে বুঝতে না পেরে গালগল্প

আরম্ভ ক'রে দেয়। তা সত্ত্বেও তাদের কিছু লোকের কাছ থেকে যে পারম্পরিক তালিকাটি পেয়েছি তা জানাবো। আমাকে বলা হয়েছে যে এই রাজবংশের বংশতালিকা রেশমী কাপড়ের উপর লিখে নগরকোট দুর্গে রাখা হয়েছে। খুব ইচ্ছে ছিল সেটি দেখার। কিন্তু নানা কারণে শেষ অবধি তা হয়ে ওঠেনি।

এই বংশের রাজাদের মধ্যে কণিক একজন। পুরুষাবরের বিহারটি ইনিই তৈরী করান। তার নামানুসারে একে কণিক-চৈত্য বলা হয়। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন লগতুরমন। কল্লর নামে এক ব্রাহ্মণ তার উজীর ছিলেন। ইনি আচমকা কিছু গুপ্তধন পান। ফলে বেশ ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তিব্বতীয় রাজবংশ অনেককাল রাজক্ষমতায় থাকার পর শেষ রাজা ধীরে ধীরে সে ক্ষমতা হারালেন। এর একটি কারণ লগতুরমনের আচার ব্যবহার ভাল ছিল না। তার উজীরের কাছে এজন্য লোকে অভিযোগ করতো। উজীর তাকে শিকলে বেঁধে বন্দী করে রাখলেন। প্রথমে তার উদ্দেশ্য ভালই ছিল; রাজাকে সংশোধন করা। কিন্তু ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে তার মন বদলে গেলো। নিজেই সিংহাসন দখল ক'রে বসলেন। তার আর্থিক ক্ষমতাও এদিকে তাকে সাহায্য করেছিল। তারপর সিংহাসন পেলেন ব্রাহ্মণ রাজা সামদ (সামন্ত)।

এরপর যথাক্রমে কমলু, ভীম, জয়পাল, আনন্দপাল ও ত্রিলোচন পাল। শেষোক্ত জন ৪১২ হিজরী সনে (খ্রীঃ ১০২১) নিহত হন এবং তার পুত্র ভীমপাল তার পাঁচ বছর পর নিহত হন (খ্রীঃ ১০২৬)।

এই হিন্দু সাহিয়া বংশ বর্তমানে বিলুপ্ত। সমগ্র বংশটির কোন চিহ্নবর্ণ নেই। একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে (এই রাজবংশ) সব রকম জাঁকজমকের মধ্যেও কল্যাণকর ও ন্যায়োচিত কাজ করার দিকে তাদের গভীর আগ্রহে কখনো একটুও শিথিলতা দেখায়নি। কারণ, তারা মহৎ অনুভূতি ও উন্নত আচার-ব্যবহার

সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। যে সময়ে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক চরম তিক্ত সেই সময়ে আনন্দপাল সুলতান মাহ্‌মুদকে যে পত্রটি দিয়েছিলেন আমি তার প্রশংসা করি। "আমি জানলাম যে তুর্কীরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ও খুরাসানে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। যদি আপনি চান তাহলে আমি পাঁচহাজার অশ্বারোহী, দশহাজার পদাতিক ও একশত হস্তী নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হতে পারি। অথবা আপনি যদি চান তবে এর দ্বিগুণ সৈন্যসহ আমার ছেলেকে পাঠাব। এই প্রস্তাব দানের বেলা তা আপনার মনে কিরূপ ধারণার সৃষ্টি করবে সে নিয়ে আমি আদৌ কোনরূপ ভাবনা-চিন্তা করছি না। আমি আপনার দ্বারা বিজিত হয়েছি, আর সেই কারণেই আমি চাইনা যে অপর কেউ আপনাকে বিজয় করুক।"

ছেলে ত্রিলোচন পালকে বন্দী করার পর থেকে তিনি মুসলমানদের প্রবল ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন। ছেলে কিন্তু তার পিতার পুরো বিপরীত ছিল।

জোয়ার-ভাটা নিয়ে আলোচনা কালে ৫৭ পরিচ্ছেদে অলবেরুনী শুনিয়েছেন সোমনাথের মন্দিরের ইতিহাস। সেই সঙ্গে দিয়েছেন এই মন্দিরকে ঘিরে গড়ে ওঠা একাধিক উপাখ্যান।

"যে সাতাশটি নক্ষত্র হয়ে চন্দ্র তার পথ-পরিক্রমা ক'রে চলে ওই নক্ষত্রগুলিকে হিন্দুরা প্রজাপতির কন্যারূপে অভিহিত ক'রে থাকেন। আরো বলে থাকেন, এই কন্যাদের সঙ্গে চন্দ্রের বিয়ে হয়েছে। চন্দ্র এদের মধ্যে রোহিণীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন ও অন্যদের চেয়ে তাকে বেশী ভালবাসতেন। অন্য বোনেরা এজন্য ঈর্ষাতুর হয়ে পিতার কাছে অভিযোগ করল। তিনি তখন চন্দ্রকে মৃদু ভৎসনা করে তাদের মধ্যে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সফল হলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে প্রজাপতি চন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন। এর ফলে তার মুখমণ্ডলে কুষ্ঠ রোগ দেখা দিলো। তিনি তখন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রজাপতির দ্বারস্থ হলেন। প্রজাপতি

তাকে বললেন -"আমার কথার কখনো অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়—সুতরাং তাকে ফিরিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। যাই হোক, এবার থেকে প্রতিমাসে ১৫ দিনের জন্য আমি তোমার লজ্জা ঢেকে দেব।" তখন চন্দ্র তাকে বললো: "কিন্তু কীভাবে পাপের এই নিদর্শন থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেতে পারি?" প্রজাপতি উত্তর দিলেন: "মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ক'রে তাকে পূজা করো।" সে তাই করলো। তিনি যে লিঙ্গ এজন্য প্রতিষ্ঠা করলেন তাই হলো সোমনাথের লিঙ্গ। কারণ সোম মানে চন্দ্র, নাথ মানে স্বামী বা প্রভু, সুতরাং সম্পূর্ণ শব্দটির মানে হলো চন্দ্রের প্রভু বা স্বামী। এই মূর্তিটি আমীর মাহ্‌মুদ ধ্বংস করেছিলেন ৪১৬ হিজরীতে। ভগবান যেন তাকে কৃপা করেন। তিনি তার উপর অংশ ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট ভাগ, তার আচ্ছাদন, সোনার ঘেরটোপ, রত্ন আভরণাদি ও কারুকার্য-মণ্ডিত পরিচ্ছদাদিসহ তিনি গজনীতে, তার আবাসে বহন ক'রে নিয়ে যাবার হুকুম দেন। এই মূর্তির অংশবিশেষ, থানেশ্বর থেকে আনা ব্রোঞ্জের তৈরী 'চক্রস্বামী'র মূর্তিসহ শহরের রঙ্গভূমিতে ফেলে রাখা হয়। অপর একটি অংশ গজনীর মসজিদের সামনে পড়ে আছে। লোকেরা তার উপরে পা ঘষে ধূলো ও কাদা পরিষ্কার করার জন্য।

লিঙ্গটি মহাদেবের জননেন্দ্রিয়ের মূর্তি। আমি তার সম্পর্কে এ রকম শুনেছি। একজন ঋষি তার স্ত্রীর সঙ্গে মহাদেবকে দেখে তার প্রতি সন্দেহ পরায়ণ হয়ে উঠেন ও অভিশাপ দেন যে তিনি তার লিঙ্গ হারাবেন। তৎক্ষণাৎ, লিঙ্গটি এমনভাবে খসে পড়ল যেন তা মহাদেবের অঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া হয়েছে। পরে ঋষি তার নির্দোষিতার কথা জানতে পারলেন ও প্রমাণাদি থেকে সে সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হলেন। তখন তিনি মহাদেবকে বললেন: 'তুমি যে অঙ্গটি হারিয়েছ তার একটি প্রতিমূর্তি ক'রে, মানুষের মধ্যে তার পূজার প্রচলন দ্বারা আমি তোমার এই ক্ষতির

পরিপূরণ করবো। এই মূর্তির পূজা ক'রে মানুষ ঈশ্বরের অনুগামী হবে ও তার নিকটবর্তী হবে।

* * * *

সিন্ধুদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে হিন্দু মন্দিরগুলিতে এই মূর্তি অনেক দেখা যায়। কিন্তু সোমনাথ এসব মন্দিরের মধ্যে সব থেকে খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। প্রতিদিন তারা একপাত্র গঙ্গাজল ও এক ঝুড়ি ফুল কাশ্মীর থেকে সেখানে আনাতো। তারা বিশ্বাস করতো যে সোমনাথের লিঙ্গ মানুষের যে কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগকে পুরোপুরি সারিয়ে দেবে, নিরাময় করে তুলবে যে কোন ভয়ঙ্কর ও দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে।

সোমনাথ এত বিখ্যাত হয়ে ওঠার মূল কারণ হলো এ স্থানটি সমুদ্রগামী লোকদের একটি বন্দর ছিল। যারা জান্‌জ দেশের সুফাল ও চীন দেশ মধ্যে নানা অঞ্চলে গমনাগমন করতেন তাদের একটি আস্তানা ছিল এটি।

* * * *

জোয়ার-ভাটার জন্যই সোমনাথ তার এই নামটি পেয়েছে। সোমনাথের ঐ পাথরটি (বা লিঙ্গটি) আসলে সমুদ্রকূলে স্থাপিত ছিল। স্থানটি বারোঈ (Baroi) এর স্বর্ণদুর্গ থেকে পূর্বে, সরস্বতী (Sarsuti) নদীর মোহনা থেকে তিন মাইলের কিছু কম পশ্চিমে। যে অঞ্চলকে বাসুদেবের জন্মস্থান বলে মনে করা হয় এবং তার ও তার পরিবার-বর্গের যেখানে মৃত্যু ও দাহ হয়েছিল সে স্থান থেকেও এর দূরত্ব বেশী নয়। প্রত্যেকবার চন্দ্র যখন ওঠে ও অস্ত যায়, জোয়ারে সমুদ্রের জল ফুলে উঠে স্থানটিকে প্লাবিত করে দিতো। তারপর চন্দ্র যখন মধ্যবিন্দুতে ও মধ্যরাতে পৌঁছায় তখন ভাটার ফলে জল

নেমে আসে ও জায়গাটি আবার দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এভাবে চন্দ্র সেখানে সদাসর্বদা নিয়োজিত থাকতো মূর্তিটির সেবা ও স্নান করাবার জন্য। সুতরাং জায়গাটিকে চন্দ্রের কাছে অতি পবিত্র স্থান বলে মনে করা হতো। যে দুর্গের পরিসর মধ্যে এ মূর্তিটি ও এর ধন-সম্পদ থাকতো তা প্রাচীন ছিল না, মাত্র একশো বছরের মতো আগে সেটি তৈরী হয়েছিল।

বারোঈ এর দুর্গটি সমুদ্রের গর্ভ থেকে দেখা দিয়েছে বলা হয়। সমুদ্রের এই অংশবিশেষের বৈশিষ্ট্য থেকে এ একেবারে অসম্ভব নয় কারণ, দিবজাত দ্বীপপুঞ্জ (মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ) ওই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলি প্রথমে বালির চর রূপে সমুদ্র থেকে উঠেছিল। তারা ক্রমে বড়ো হলো, উঁচু হলো ও নিজেদের বিস্তার করে চললো। তারপর নির্দিষ্ট কিছু কাল ওই ভাবেই থেকে গেলো। এরপর যেন বার্দ্ধক্যের জন্যই জীর্ণ হয়ে পড়লো। এক একটি দ্বীপের ভাঙ্গন সুরু হলো এবং গলে মিলিয়ে যাবার মতন জলের নীচে লোপাট হয়ে যেতে থাকলো। অধিবাসীরা যখন যে দ্বীপটির বিলোপ সুরু হয় তাকে ছেড়ে যে সব দ্বীপ সমুদ্রের উপর মাথা তুলবার জন্য মুখিয়ে উঠেছে সেরকম নতুন ও তাজা দ্বীপে আশ্রয় নিতো। যাবার সময় নারকেল গাছের চারাগুলিকে তারা সঙ্গে নিয়ে যেতো।

দুর্গটিকে যে স্বর্ণদুর্গ বলা হয় তা মামুলি নাম হলেও হতে পারে। তবে, খুব সম্ভবতঃ, আক্ষরিক অর্থেই এটিকে নিতে হবে। কেননা, জাবজ দ্বীপপুঞ্জকেও সুবর্ণদ্বীপ বলা হয়ে থাকে। যদি তুমি সেখানকার অল্প একটুখানি মাটি নিয়ে ধোও তবে তা থেকে যথেষ্ট সোনা পাবে।”

ভারতের ভৌগলিক বিবরণ ও বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা

পৃথিবীর পূর্বার্ধে সাগর উত্তর ভূ-ভাগের অভ্যন্তরে ততটাই প্রবেশ করেছে ঠিক যতটা পশ্চিমার্ধের ভূ-ভাগ প্রবেশ করেছে দক্ষিণ সাগর অভ্যন্তরে। অনেক জায়গায় উপসাগর ও মোহনা সৃষ্টি হয়েছে। উপসাগর সাগরের অংশ। মোহনা নদীসমূহের সাগর-নির্গমন পথ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাগরকে যে দ্বীপ বা যে দেশের সীমানা ঘিরে সেটি অবস্থিত তদনুসারে নামিত করা হয়। ভারত সীমানা ঘিরে অবস্থিত সাগরের নাম এই কারণে ভারত মহাসাগর।

পর্বতগুলির ভৌগলিক বিন্যাসের চিত্রটি কল্পনায় আনুন। বিরাট বিরাট অভ্রভেদী পর্বতমালা যেন এক সুবিশাল পাইন গাছের শাখাপ্রশাখার মত পৃথিবীর মধ্যভাগে নিজেকে বিস্তার করেছে। পুব থেকে পশ্চিমে ইহা চীন, তিব্বত, তুর্কীদের দেশ, কাবুল, বাদাকশান, তোখারিস্তান, বামিয়ান, এলঘোর, খুরাসান, মিডিয়া, আধরবাইজান, আর্মেনিয়া, রোমান সাম্রাজ্য, ফ্রাঙ্ক ও গ্যালিসীয়দের দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। লম্বায় যে রকম, চওড়ায়ও সেই রকম চোখে পড়ার মতো। এছাড়া আবার অনেক শাখা-প্রশাখা সমতল বসতি মধ্যেও হানা দিয়েছে। যে সব নদী সমতলকে সুজলা করেছে তাদের অধিকাংশই এই পর্বতমালা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে নেমে গিয়েছে। সমতল অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি হলো ভারত। এর দক্ষিণ প্রান্ত পূর্বোক্ত ভারত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত। অপর তিনটি দিক সুউচ্চ পর্বত-প্রাচীরে ঘেরা—যে পর্বত থেকে নেমে আসা বিভিন্ন জলধারা নদীর রূপ নিয়ে এদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়। ভারতের মৃত্তিকা যদি আপনি নিজের চোখে দেখেন ও এর প্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ করেন তবে আপনার এই ধারণাই দেখা দেবে যে এই অঞ্চল একদিন সমুদ্র ছিল। এখানকার মাটি যতো গভীর করে খনন করুন না কেন আপনি গোলাকার পাথর পাবেন। পর্বতমালার নিকট-অঞ্চল,

যেখানে নদীগুলির স্রোত অতি তীব্র, দেখা যায় সেখানে বিরাট বিরাট আকারের পাথর। পর্বত থেকে দূরবর্তী অঞ্চল, যেখানে নদীগুলির স্রোত তুলনামূলক ভাবে ধীর, সেখানে পাথরের আকার তুলনামূলক ভাবে ছোট। নদী যেখানে ধীর বা বদ্ধ অবস্থা ধারণ করেছে সেই মোহনায় বা সমুদ্রের কাছে দেখতে পাবেন পাথরের চূর্ণ বিচূর্ণ বালু চেহারা। যে সব কথা এখানে বলা হলো তার সব কিছু যদি বিবেচনায় আনেন তবে আপনাকে উপরের সিদ্ধান্তেই আসতে হবে। মেনে নিতে হবে, পর্বতমালা থেকে নেমে আসা জলস্রোত বয়ে আনা পলিদ্বারা এ অঞ্চল ধীরে ধীরে ভরাট হয়েছে।

কনৌজের চারপাশের দেশগুলিকে নিয়ে ভারতের মধ্য অঞ্চল। একে তারা মধ্যদেশ বলে। ভৌগোলিক দিক থেকেও এটি মধ্যাঞ্চল। সাগর ও পর্বতের ঠিক মাঝামাঝি। গরম ও ঠাণ্ডা দেশগুলিরও মাঝামাঝি স্থানে এটি। আবার পূর্ব ও পশ্চিম সীমানারও মধ্য অঞ্চলে। এটি একটি রাজনৈতিক কেন্দ্রও। পূর্বকালের সব থেকে খ্যাতনামা বীর ও রাজাদের আবাস ছিল এখানেই।

সিন্ধুদেশ কনৌজের পশ্চিমে। আমাদের দেশ থেকে সিন্ধু যেতে হলে আমরা নীমরৌজ (সিজিস্তান) থেকে যাত্রা করি। হিন্দ বা মূল ভারত ভূখণ্ড মধ্যে যেতে হলে কাবুলের দিক থেকে যাত্রা আরম্ভ করি। এই-ই এর একমাত্র রাস্তা নয় অবশ্য। যদি পথের বাধা দূর ক'রে ক'রে এগিয়ে যেতে পারেন তবে যেকোন স্থান থেকেই আপনি ভারতে প্রবেশ করতে পারেন। যেসব পর্বত পশ্চিম দিকে ভারতের সীমানা রূপে খাড়া রয়েছে সেখানে হিন্দু পার্বত্য উপজাতিরা অথবা হিন্দুদের নিকটবর্তী পার্বত্য উপজাতিরা বাস করে। এরা অতি বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন বন্য জাতি।

কনৌজ গঙ্গার পশ্চিমদিকে অবস্থিত একটি খুব বড় শহর। এর অধিকাংশই বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ ও জনহীন অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। যেদিন থেকে গঙ্গার পূবদিক বারী শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত

হয়েছে তখন হতে এ অবস্থা। দুই শহরের মধ্যে তিন বা চারদিনের হাঁটাপথের ব্যবধান।

কনৌজ (বা কান্যকুব্জ) যেমন বিখ্যাত হয়েছে পাণ্ডবদের জন্য তেমন মথুরা নগরী খ্যাতিলাভ করেছে বাসুদেবের জন্য। এ নগরীটি যমুনা নদীর পূবকূলে। মথুরা ও কনৌজ মধ্যে দূরত্ব ২৮ ফারসাক (এক ফারসাক = ৪ মাইল)।

থানেশ্বর মথুরা ও কনৌজ থেকে উত্তর দিকে দুটি নদীর মধ্য স্থানে। কনৌজ থেকে দূরত্ব ৮০ ফারসাকের মতো, মথুরা থেকে ৫০ ফারসাকের মতো।

গঙ্গানদীর উৎপত্তি যে পর্বতটি থেকে তার কথা আগেই বলেছি। এর উৎসকে গঙ্গাদ্বার বলা হয়। এখানকার অধিকাংশ নদী এই একই পর্বতমালা থেকে জন্ম নিয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে কিরূপ দূরত্ব তা জানতে হলে, যারা প্রকৃতপক্ষে সে সব স্থানে যাননি তাদের পক্ষে সেজন্য পরম্পরার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পরম্পরা এমন ধরনের যে টলেমি ইতিপূর্বেই বার বার তার হস্তান্তর-কারীদের বিরুদ্ধে, গালগল্পের প্রবণতার অভিযোগ করেছেন। সৌভাগ্য-বশতঃ আমি এমন একটি নিয়ম বের করতে সক্ষম হয়েছি যার সাহায্যে তাদের মিথ্যাকে আয়ত্বে আনা সম্ভব। হিন্দুরা সাধারণতঃ একটি বলদ ২০০০ থেকে ৩০০০ মণ বোঝা বহন করতে পারে বলে মনে করে—যা একটি বলদের প্রকৃত বহনক্ষমতা অপেক্ষা অনেক বেশি। এর ফলে একটি গাড়িকে নিয়ে বহুদিন ধরে একই পথে বার বার যাওয়া আসা করতে বাধ্য হয় তারা। প্রতিটি বলদের জন্য যতটা মাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা যতকাল পর্যন্ত তারা না নিয়ে যেতে পারে প্রকৃতপক্ষে ততকাল পর্যন্ত তাদের যাতায়াত করতে হয়। তারপর পুরো শকটবাহিনী সব মাল পৌঁছে দিতে যতদিন সময় নিয়েছে তারই ভিত্তিতে 'এই এতদিনের পথ'

রূপে দুই স্থানের দূরত্ব নির্ধারণ করে। যথেষ্ট সতর্কতা ও পরিশ্রম ক'রে তবেই একজন হিন্দুর কাছ থেকে সঠিক বিবরণ আদায় করা যায়। যাই হোক, যা আমরা সঠিকভাবে জানিনা সে সম্পর্কে এই ভাবে যা জানা যায় তাকে নিশ্চয়ই আমাদের গোপন রাখা ঠিক হবে না। তাই, বিবরণে কোথাও যদি কোন ভুল থেকে থাকে সেজন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বিবরণ আরম্ভ করছি।

একজন লোক কনৌজ থেকে দক্ষিণ দিকে যমুনা ও গঙ্গা অভিমুখে যাত্রা করলে এই প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখতে পাবে: জজ্জমৌ—কনৌজ থেকে ১২ ফারসাক; অভপুরী—৮ ফারসাক; কুরহ—৮ ফারসাক; বরহমশীল—৮ ফারসাক; প্রয়াগের বৃক্ষ—১২ ফারসাক। এই স্থানটিতে গঙ্গা ও যমুনার স্রোত মিলিত হয়েছে। এখানে হিন্দুরা নিজেদের উপর নানারূপ দৈহিক পীড়ন চালিয়ে থাকে। সে সবের বিবরণ ধর্ম্মীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে লেখা বইতে দেওয়া আছে। গঙ্গা যে জায়গায় সাগরে মিশেছে তার দূরত্ব প্রয়াগ থেকে ১২ ফারসাক।

প্রয়াগের বৃক্ষ থেকে দক্ষিণের সমুদ্রের দিকে যে সব দেশ আছে তা হলো: অর্কুতীর্থ—১২ ফারসাক; উবর্যাহার (Uwaryahār)—৪০ ফারসাক, উরদবিশাউ—সমুদ্রতটে—৫০ ফারসাক।

সেখান থেকে সমুদ্র-তীর বরাবর অনেক অঞ্চল রয়েছে যা বর্তমানে 'জউর' (Jaur)-এর অধীন। প্রথমে দারায়ুর—এটি উদরবিশাউ থেকে ৪০ ফারসাক পরে। তারপর কাঞ্চী—৩০ ফারসাক, মলয়—৩০ ফারসাক, কুন্‌ক—৩০ ফারসাক। এইটি হলো 'জউর' এর অধীনে এদিককার শেষ অঞ্চল।

বারী থেকে গঙ্গা বরাবর পূবদিকে গেলে আপনি এই স্থানগুলির দেখা পাবেন: অযোধ্যা—২৫ ফারসাক; বারাণসী—২০ ফারসাক।

এরপর দিক পরিবর্তন ক'রে, দক্ষিণের পরিবর্তে পূবে গেলে আপনি আসবেন বারাণসী থেকে শরওয়ার—২৫ ফারসাক, পাটলিপুত্র—২০ ফারসাক, মুঙ্গের—১৫ ফারসাক, জনপ—৩০ ফারসাক, দুগুমপুর

—৫০ ফারসাক, গঙ্গা-সায়র—যেখানে গঙ্গা সমুদ্রে মিশেছে—৩০ ফারসাক।

কনৌজ থেকে পূবদিকে গেলে আপনি পাবেন : বারী—১০ ফারসাক, দুগুম—৪৫ ফারসাক, শিলহট রাজ্য—১০ ফারসাক, বিহত শহর—১২ ফারসাক। ডানদিকে আরো অনেকদূর এগিয়ে গেলে পাবেন তিলবত। এর অধিবাসীদের তরু (Tarū) বলা হয়। অতি কালো রঙের চেহারা, তুর্কীদের মত চেপটা নাক। তারপর পড়বে কামরু পর্বতমালা, এটি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

তিলবতের উল্টোদিকে—অর্থাৎ বাঁদিকে রয়েছে নইপাল (নেপাল)। সেদিকের দেশগুলিতে ভ্রমণ করেছেন এমন একজন লোক সে অঞ্চল সম্পর্কে আমাকে এরকম বিবরণ দিয়েছেন : তানবত থেকে তিনি পূবমুখে যাত্রা করেন। তারপর বাঁদিকে মোড় নিলেন। ২০ ফারসাক দূরত্ব পার হয়ে পৌছলেন গিয়ে নইপাল। এর অধিকাংশ অঞ্চলই চড়াই। নইপাল থেকে তিনি ভোটেশার গেলেন ৩০ দিনে। প্রায় ৮০ ফারসাক পথ। উৎরাই অপেক্ষা চড়াই অঞ্চলই সেখানে বেশি। সেখানে একটি নদী আছে যা তাকে যাবার পথে বার কয়েক অতিক্রম করতে হয়েছে দুটি ক'রে বেত দিয়ে বাঁধা তক্তার সেতু দিয়ে। এই তক্তাগুলি একদিকের পাহাড় থেকে অন্যদিকের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ও দুদিকে তৈরী করা শিলা-স্তম্ভের সঙ্গে বাঁধা। এই সেতুর উপর দিয়ে লোকেরা পিঠে মাল বয়ে এপার ওপার নিয়ে যায়। সেতুর একশ গজ নীচে পাহাড় চৌচির ক'রে দেবার মতো ভয়ঙ্কর গতিতে নদী ছুটে চলেছে তুষারের মতো সাদা ফেনার তরঙ্গ তুলে। সেতুর অন্যদিকে ঐ সব বোঝা চাপানো হয় কালো ছাগলের পিঠে। সংবাদদাতা আমায় বললেন, তিনি সেখানে চারচক্ষু হরিণ দেখেছেন। এ নাকি প্রকৃতির আকস্মিক বিকৃতি নয়। সেখানকার সমস্ত হরিণই নাকি ওই রকমের।

ভোটেশর তিব্বতের প্রথম সীমান্ত। সেখানে ভাষার পরিবর্তন

ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে পোষাক-পরিচ্ছদ আর নৃতাত্ত্বিক চেহারারও পরিবর্তন ঘটেছে। সেখান থেকে সর্বোচ্চ পর্বতচূড়ার দূরত্ব ২০ ফারসাক। এই পর্বতচূড়া থেকে ভারতকে কুয়াশার আস্তরণের নিচে অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখায়। এই চূড়ার তলদেশ ঘিরে ছোট ছোট পর্বত রয়েছে। তিব্বত ও চীনকে সেখান থেকে লাল বর্ণের মত দেখা যায়। উৎরাইয়ের পরিমাণও তিব্বত ও চীনের দিকে ১ ফারসাকের কম।

কনৌজ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গেলে আপনি পৌঁছবেন আশী। এর দূরত্ব কনৌজ থেকে ১৮ ফারসাক। সহন্যা—১৭ ফারসাক, জন্দ্রা—১৮ ফারসাক, রাজৌরী—১২ ফারসাক, বজান—গুজরাটের রাজধানী—২০ ফারসাক। আমাদের লোকেরা (মুসলমানেরা) এ শহরকে নারায়ণ বলে। এটি ধ্বংস হয়ে যাবার পর এখানকার লোকেরা যদুরা-তে বসতি গড়েছে।

'কনৌজ ও মাহুরা' এবং 'কনৌজ ও বজান' দূরত্ব সমান অর্থাৎ ২৮ ফারসাক। যদি কোন লোক মাহুরা থেকে উজ্জয়িনী যেতে চায় তবে তাকে গ্রামের মধ্য দিয়ে পাঁচ ফারসাক পথ যেতে হয়। উভয়ের মাঝে প্রকৃত দূরত্ব আরো কম। ৩৫ ফারসাক যাবার পর সে একটি বড় গ্রামে পৌঁছয়। এটির নাম দূদহী। তারপর বামহুর। এটি দূদহী থেকে ১৭ ফারসাক। এরপর ভৈলসান ৫ ফারসাক। হিন্দুদের মধ্যে এই জায়গাটির খুব প্রসিদ্ধি রয়েছে। এখানে যে বিগ্রহের পূজা করা হয় তার নাম ও জায়গাটির নাম এক। তারপর অরদীন—৯ ফারসাক। সেখানে যে বিগ্রহের পূজা করা হয় তার নাম মহকাল (মহাকাল)। এরপর ধার—৭ ফারসাক।

বজান থেকে দক্ষিণ দিকে গেলে আপনি উপস্থিত হবেন মইওয়ার। বজান থেকে এর দূরত্ব ২৫ ফারসাক। এ রাজ্যটির রাজধানী যত্তরোর। এই শহর থেকে মালওয়া (মালব)-র রাজধানী ধার-এর দূরত্ব ২০ ফারসাক। উজ্জয়িনী শহর ধার-এর পূবদিকে

৭ ফারসাক। উজ্জয়িনী থেকে ভইলসান ১০ ফারসাক। এটিও মালওয়া রাজ্যের অন্তর্গত।

ধার থেকে দক্ষিণ দিকে গেলে আপনি এসে পৌঁছবেন ভূমিহর। ধার থেকে এর দূরত্ব ৩০ ফারসাক। কন্দ—২০ ফারসাক। নমাতুর—১০ ফারসাক। এটি নর্মদা নদী তীরে। তারপর অলিশপুর—২০ ফারসাক। তারপর গোদাবরী তটে মন্দগীর—৬০ ফারসাক।

পুনরায় ধার থেকে দক্ষিণে গেলে আপনি পাবেন নমিয়্যা—৭ ফারসাক। মরহট্টা দেশ—১৮ ফারসাক। কঙ্কণ প্রদেশ ও তার রাজধানী তান—সমুদ্র উপকূলে—২৫ ফারসাক।

লোকে বলে, দণ্ডক নামে খ্যাত কঙ্কণের সমতলভূমিতে শরভ নামে একটি প্রাণী বাস করে। চার পা বিশিষ্ট এই প্রাণীটির পিঠের দিকে আরো চারটি পায়ের মতো প্রত্যঙ্গ রয়েছে। এর একটি ছোট আকারের শুঁড় ও দুটি লম্বা শিঙ আছে। এই শিঙ দিয়ে সে হাতীকে পর্যন্ত আক্রমণ ক'রে চিরে দু'ফালি ক'রে দেয়। এর চেহারা অনেকটা মহিষের মতো কিন্তু আকারে গণ্ডারের চেয়েও বড়ো। চলতি কাহিনী অনুসারে এরা সময়ে সময়ে কোন একটি প্রাণীকে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে মেরে ফেলে তার পুরো দেহটা বা অংশবিশেষ তুলে নিয়ে পিঠের উপর থাকা চার পায়ের মাঝে রেখে দেয়। সেখানে তা পচে গিয়ে এক ঝাঁক দুর্গন্ধ পোকার জন্ম দেয়। সেগুলি তার সারা দেহে চরে বেড়িয়ে ঘা-এর সৃষ্টি করে। এর ফলে এই প্রাণীগুলি নিজের দেহ গাছের গায়ে ঘষে বেড়ায় এবং এই ভাবে শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে। লোকে এ জন্তুটি সম্বন্ধে প্রায়ই এ কথা বলে. যে বজ্রের গর্জনকে এরা কোন জন্তুর গর্জন বলে মনে করে ও সেই অদৃশ্য শত্রুকে আক্রমণের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায়। এ ভাবে তাড়া ক'রে এরা পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠে যায় ও সেখান থেকে তার উদ্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ফলে নিচে পড়ে গিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাণ হারায়।

ভারতে প্রচুর গণ্ডার আছে, বিশেষভাবে গঙ্গার নিকটবর্তী অঞ্চল-

গুলিতে। এর গড়ন অনেকটা মহিষের মতো। কালো আঁশে ঢাকা চামড়া ও থুতনীর নিচে গলকম্বল। প্রত্যেক পায়ে তিনটি ক'রে হলুদ রঙের খুর। সামনের দিকের খুরটি সব থেকে লম্বা, অন্য দুটি তার দুপাশে। লেজ বড়ো নয়। অন্যান্য জন্তুদের তুলনায় চোখ কিছুটা নীচের দিকে, নাকের ডগায় একটি শিঙ রয়েছে ও সেটি উপরের দিকে বাঁকানো। ব্রাহ্মণেরা একমাত্র এই গণ্ডারের মাংস খেতে পারেন। একটি হাতী অল্প বয়স্ক একটি গণ্ডারের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে কী ভাবে তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল আমি নিজের চোখে সে ঘটনা দেখেছি। গণ্ডারটি তার শিঙ দিয়ে হাতিটির সামনের একখানি পা জখম ক'রে দেয় ও মাটিতে মুখ থুবড়িয়ে ফেলে দেয়।

আমার ধারণা ছিল যে গণ্ডার ও রাইনোসেরস এক। কিন্তু নিগ্রোদের দেশ সুফাল গিয়েছেন এমন এক ব্যক্তি আমায় বললেন যে কর্ক—যাকে নিগ্রোরা ইম্পীলা (Impīla) বলে—রাইনোসেরস-এর তুলনায় তার সঙ্গেই এর সাদৃশ্য বেশি। ইম্পীলা বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। তার মাথার খুলির উপর মোচাকৃতির শিঙ রয়েছে। শিঙের গোড়ার দিকটা স্থূল, কিন্তু খুব বেশি উঁচু নয়। শিঙের ফলার ভিতরের দিকটা কালো ও বাকি সব সাদা। সামনের দিকে আগেরটির তুলনায় লম্বা আরেকটি একই ধরনের শিঙ রয়েছে। যখন প্রাণীটি তা দিয়ে আঘাত করতে চায় সেটি খাড়া হয়ে ওঠে। যাতে চিরতে ও বিঁধতে পারে সেজন্য সে ওই শিঙটিকে পাথরের গায়ে ঘষে ঘষে তীক্ষ্ণ করে। তার খুর ও গাধার মত লোমশ লেজ রয়েছে।

নীলনদের মতো ভারতের নদীগুলিতেও কুমির আছে। এই ঘটনা এবং নদীসমূহের গতিপথ ও সাগরে মিলনস্থল সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতুই সরল অলজাহিজ মুহরান (সিন্ধু) কে নীল নদের একটি শাখা বলে মনে করেছিলেন। ভারতীয় নদীগুলিতে কুমির ছাড়া ঐ গোত্রের আরো নানা বিস্ময়কর প্রাণী রয়েছে। যথা: মকর, বিচিত্র রকমের সব মাছ এবং চামড়ার থলির মতো এক রকমের প্রাণী যা জাহাজের

কাছে আবির্ভূত হয়ে সাঁতরে খেলা করে। একে বুরলু বলা হয়। আমার ধারণা এগুলি শুশুক বা তারই একটি প্রজাতি। লোকে বলে এর মাথায় শুশুকের মতোই শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য একটি ছেঁদা রয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের নদীগুলিতে একটি প্রাণী আছে যাকে গ্রাহ, জলতন্তু, তন্দুয়া ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়। এর শরীর খুব পাতলা ও অতি লম্বা। লোকে বলে যে এরা শিকারের অপেক্ষায় জলের মধ্যে চুপচাপ ওৎ পেতে অপেক্ষা করে। মানুষ হোক আর অন্য কোন জন্তু জানোয়ার হোক, যদি জলে নেমে দাঁড়িয়ে থাকে তবে এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এটি প্রথমে শিকারকে ঘিরে আলতো ভাবে পাঁক খেয়ে চলে ও তারপর ধীরে ধীরে জোর প্যাঁচ কষতে শুরু করে। এভাবে শিকারের পায়ে দড়ির কঠিন বাঁধনের মতো নিজেকে জড়িয়ে ফেলে তার পাখানি বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। একে দেখেছে এমন একজন লোক আমাকে বললেন যে এর মাথা কুকুরের মতো এবং লেজের দিকে বহু লম্বা লম্বা শুঁড় আছে। শিকার যদি সহজে দুর্বল হয়ে না পড়ে তবে সে এগুলি দিয়ে তাকে প্যাঁচিয়ে ধরে। এই শুঁড়গুলির সহায়তায় শিকারকে সে তার লেজের দিকে টেনে আনে এবং তারপর যখন শুঁড় ও লেজ দিয়ে একেবারে শক্তভাবে প্যাঁচিয়ে ধরে তখন শিকারকে প্রাণ খোয়াতে হয়।

অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা ছেড়ে এবার মূল বিষয়ে ফিরে আসি।

বজান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে আপনি দেখা পাবেন অনহিলবর-এর। দূরত্ব—৬০ ফারসাক। তারপর সাগরকূলে সোমনাথ—৫০ ফারসাক।

অনহিলবর থেকে দক্ষিণ দিকে গেলে প্রথমে পাবেন লার দেশ। দূরত্ব ৪২ ফারসাক। এর দুটি রাজধানী বিহরোজ ও রিহনজুর; দুটিই সাগরতটে তান থেকে পূবদিকে।

বজ্জান থেকে পশ্চিমে গেলে ৫০ ফারসাক পরে আসবে মুলতান। তারপর ১৫ ফারসাক পরে ভাটী।

ভাটী থেকে এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যান—১৫ ফারসাক দূরে রয়েছে অয়োর। এটি সিন্ধুনদীর দুই শাখার মধ্যে থাকা একটি জনপদ। বামহনওয়া অলমনসুর এখান থেকে ২০ ফারসাক। তারপর সিন্ধুনদীর মোহনায় লোহরানী—৩০ ফারসাক।

কনৌজ থেকে উত্তর উত্তর-পশ্চিমে গেলে আপনি পাবেন শির্ষারহ। কনৌজ থেকে ৫০ ফারসাক। পিঞ্জৌর ১৮ ফারসাক। এ জায়গাটি পর্বত উপরে। এর উলটো দিকে সমতলভূমিতে থানেশ্বর। জালন্ধর-এর রাজধানী দহমাল, পর্বত পাদদেশে, ১৮ ফারসাক। বল্লাওয়র—১০ ফারসাক। তারপর পশ্চিমে গেলে ১৩ ফারসাক পরে পাবেন লড্ড। ৮ ফারসাক গেলে রাজগিরী দুর্গ। তারপর উত্তরদিকে ২৫ ফারসাক এগোলে আপনি পাবেন কাশ্মীর।

কনৌজ থেকে পশ্চিমমুখো এগিয়ে চললে ১০ ফারসাক পরে পাবেন দিয়ামৌ। আরো ১০ ফারসাক পরে কুটী। আনার তারপর ১০ ফারসাক, মীরাট—১০ ফারসাক, পানিপথ—১০ ফারসাক। শেষোক্ত দুই স্থানের মধ্য দিয়ে যমুনা নদী বয়ে চলেছে। এরপর কওয়ীতল—১০ ফারসাক। তারপর সুন্নাম—১০ ফারসাক।

এবার উত্তর-পশ্চিম দিকে চলুন, আপনি পাবেন : অদিত্যহৌর—৯ ফারসাক, জজ্জনীর—৬ ফারসাক, মন্দহুকুর—৮ ফারসাক। এটি লৌহায়ুর-এর রাজধানী। ইরাওয়া (ইরাবতী) নদীর পূবদিকে অবস্থিত। তারপর চণ্ডাহ নদী—১২ ফারসাক। পরে, বিয়াত্তা (বিপাশা) নদীর পশ্চিম ভাগ—জইলম (ঝিলম) নদী—৮ ফারসাক। এরপর সিন্ধুনদীর পশ্চিমতীরে, কান্দাহারের রাজধানী ওয়াইহিন্দ ২০ ফারসাক। পুরষাবর (পেশোয়ার)—১৪ ফারসাক, দুনপুর—১৫ ফারসাক, কাবুল—১২ ফারসাক, ঘজনা (গজনী)—১৭ ফারসাক।

কাশ্মীর অতি দুরারোহ পর্বতমালা ঘেরা মালভূমি অঞ্চল। এর দক্ষিণ ও পূর্বভাগ হিন্দুদের। পশ্চিমভাগ বহু রাজ-রাজড়ার অধীন। বোলর শাহ, শুখনান শাহ এদের অন্যতম। এছাড়া বাধকশান-এর সীমান্তবর্তী সুদূর অঞ্চলগুলি ওয়খান শাহের অধীন। উত্তর ও পূবের কিছু অংশ খোটান ও তিব্বতের তুর্কীদের অধিকারে। ভোটেশর থেকে তিব্বতের মধ্য দিয়ে কাশ্মীর প্রায় ৩০০ ফারসাক।

কাশ্মীরের অধিবাসীরা মূলতঃ পায়ে হেঁটে চলাফেরা করে। তাদের কোন মানুষ বহনকারী জন্তু নেই কিংবা হাতীও নেই। অভিজাত ব্যক্তিরা 'কট' (Katt) নামে এক ধরনের পালকীতে চড়ে যাতায়াত করে। এটি মনুষ্যবাহিত। তারা তাদের দেশের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা-ক্ষমতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। এই কারণে, প্রবেশ পথগুলি ও ওই দেশাভিমুখী রাস্তাগুলির উপর আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সব রকম যত্ন নেয়। এর ফলে তাদের সঙ্গে কোনরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো বিশেষ কষ্টকর। আগে তারা একটি কি দুইটি বিদেশী জাতিকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দিতো, বিশেষ করে ইহুদীদের। কিন্তু আজকাল তারা যে সব হিন্দুকে ব্যক্তিগত ভাবে জানে না তাদেরও প্রবেশ করতে দেয় না। অন্যদের তো আরো কম।

কাশ্মীরের সব থেকে পরিচিত প্রবেশপথটি সিন্ধু ও ঝিলম নদীর মাঝামাঝি অবস্থিত 'বব্রহান' হয়ে এগিয়েছে। সেখান থেকে কুশ্নারী ও মহবী নদীর সংযোগস্থলে থাকা সেতুটির দুরত্ব ৮ ফারসাক। দুটি নদীই শমীলান পর্বতমালা থেকে নেমে এসেছে ও ঝিলমে মিলিত হয়েছে। সেখান থেকে পাঁচদিন চললে আপনি ঝিলম নদীর গিরিখাতে পৌঁছতে পারবেন। এই গিরিখাতের অপর প্রান্তে ঝিলম নদীর দুই তীর জুড়ে প্রহরা-শিবির দ্বার অবস্থিত। এই গিরিখাত পার হলে আপনি সমতলের দেখা পাবেন ও আরো দুদিন লাগবে কাশ্মীরের রাজধানী অদ্দিশ্‌তন পৌছাতে। সেখানে যাবার পথে

উশকারা গ্রাম পড়বে। এটি ঠিক বরমূলার মতো উপত্যকার উভয় দিকে বিস্তৃত।

কাশ্মীর নগরী ঝিলম নদীর উভয় তটে চার ফারসাকের মতো অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। শহরটির দুই অংশের মধ্যে সেতু ও খেয়া নৌকার যোগাযোগ রচনা করা হয়েছে। হরমকোট পর্বতমালা থেকে ঝিলম নদী জন্ম নিয়েছে। গঙ্গার উৎপত্তিও এখান থেকেই। এটি ঠাণ্ডা, অগম্য, চিরতুষারাবৃত অঞ্চল। এর পিছন দিকে মহাচীন। পর্বত থেকে নেমে দুদিনের পথ পেরিয়ে তারপর ঝিলম অদ্দিশ্‌তন অতিক্রম করেছে। তারপর চার ফারসাকের মতো প্রবাহিত হবার পর এক বর্গ ফারসাকের মতো বিস্তৃত এক জলাভূমিতে গিয়ে পড়েছে। এই জলাভূমির চারপাশে লোকেরা বৃক্ষাদি চাষ-আবাদ করে। তাছাড়া এই জলাভূমির যে সব জমি উদ্ধার ক'রে চাষ-আবাদ করা সম্ভব, তাও করা হয়েছে। এই জলাভূমি থেকে বেরিয়ে ঝিলম উশকারা শহর হয়ে পূর্বোক্ত গিরিখাত অঞ্চলে গিয়ে পড়েছে।

তুর্কীদের অধিকারভুক্ত উনাঙ পর্বতমালা হতে সিন্ধু নদীর জন্ম। নিচে বলা পথ ধরে এগিয়ে গেলে সেখানে আপনি পৌঁছাতে পারবেন। যে গিরিখাত দিয়ে আপনি কাশ্মীর প্রবেশ করেছেন তা পার হয়ে মালভূমি অঞ্চলে প্রবেশ ক'রে আপনাকে আরো দুদিন বোলোর ও শমীলান পর্বতমালা অতিক্রম করতে হবে। এখানে ভট্টবরয়ান নামে তুর্কী পার্বত্য উপজাতিদের বসবাস। তাদের রাজার উপাধি ভট্টশাহ। তাদের শহরগুলির নাম গিলগিট, অশ্বির ও শিলতাস। ভাষা—তুর্কী। এদের সহসা সহসা আক্রমণের দরুন কাশ্মীরকে যথেষ্ট ভুগতে হয়। নদীর বাঁদিক ধরে গেলে আপনি কৃষি-অঞ্চলের মধ্য দিয়ে রাজধানী পৌঁছাবেন। ডানদিক দিয়ে যেতে হলে গায়ে গায়ে লেগে থাকা গ্রামের মাঝ দিয়ে এগোতে হবে। এই পথ ধরে আপনি রাজধানীর দক্ষিণ দিকে পৌঁছাবেন। তারপর পাবেন কুলারজক পর্বত। দামলাবন্দ পর্বতের মতো এটির চূড়াও

গম্বুজাকৃতি। অঞ্চলটি চিরতুষারাবৃত। এই স্থানটিকে তাকেশার ও লৌহাওয়ার (লাহোর) থেকে সব সময়ে দেখা যায়। এই পর্বত চূড়া ও কাশ্মীরের মালভূমির মধ্যে দু' ফারসাকের ব্যবধান। এর দক্ষিণে রাজগিরী দুর্গ ও পশ্চিমে লহুর দুর্গ। যে সব দুর্গ এ পর্যন্ত আমি দেখেছি তার মধ্যে এ দুটি সব থেকে সুরক্ষিত। রাজাওয়ারী শহর পর্বত চূড়া থেকে তিন ফারসাক দূরে। এই শহরটিই হলো আমাদের বণিকদের শেষ সীমানা, এর ওপারে কখনো তারা যায় না।

এই হল উত্তরদিকের ভারত সীমানা।

ভারতের পশ্চিম সীমান্তের পর্বতগুলিতে বিভিন্ন আফগান পার্বত্য উপজাতিদের বাস। এর বিস্তৃতি সিন্ধু-উপত্যকার নিকট অঞ্চল পর্যন্ত।

ভারতের দক্ষিণ-সীমা সাগর দিয়ে ঘেরা। ভারতের সাগরতট মকরানের রাজধানী তীজ থেকে আরম্ভ হয়েছে। দক্ষিণ-পূব দিকে তা অল-দইবল পর্যন্ত প্রসারিত। দূরত্ব ৪০ ফারসাকের বেশি। এ দুই স্থানের মধ্যে তুরান উপসাগর।

এই উপসাগরের পর ছোট মুনহা ও বড় মুনহা। তারপর বাওয়ারীজ অর্থাৎ কচ্ছ ও সোমনাথের জলদস্যুদের আস্তানা। এই দস্যুরা বীর নামে এক ধরনের জাহাজে চড়ে জলদস্যুগিরি করে বলে তাদের এই নামে অভিহিত করা হয়। সাগরতটের জায়গাগুলির নাম: তবলেশ্বর দইবল থেকে ৫০ ফারসাক। লোহরাণী—১২ ফারসাক। বগ—১২ ফারসাক। যেখানে বারোঈ অবস্থিত ও মুকল গাছ জন্মে সেই কচ্ছ—৬ ফারসাক। সোমনাথ—১৪ ফারসাক। কম্বায়েত—৩০ ফারসাক। অস্বিল দু'দিনের পথ। বিহরোজ—৩০ ফারসাক। সন্দান—৫০ ফারসাক। সুবারা—৬ ফারসাক। তান—৫ ফারসাক।

এরপর তটরেখা এগিয়ে গেছে যেখানে জীমুর নগর অবস্থিত সেই লারান দেশের দিকে। এরপর বল্লভ, কাঞ্জি, দারবদ। তারপর এক বিরাট উপসাগর। এখানে সিংহল দ্বীপ অর্থাৎ স্বর্ণদ্বীপ। এই উপসাগর-

কূলে পঞ্জয়াবর নগর। এ নগরটি ধ্বংস হবার পর রাজা জউর এর পশ্চিমদিকে উপকূলের কাছে আর একটি নগর গড়ে তোলেন। তার নাম দেন পদনার।

উপকূলের পর আসবে উম্মালনার। পরে, স্বর্ণদ্বীপের উলটোদিকে রামেশ্বর। এ দুয়ের মধ্যে সাগরের ব্যবধান ১২ ফারসাক। পঞ্জয়াবর থেকে রামেশ্বর ৪০ ফারসাক। রামেশ্বর ও সেতুবন্ধ মধ্যে দূরত্ব দু' ফারসাক। সেতুবন্ধ মানে সমুদ্রের সেতু। এটি দশরথের পুত্র রামের তৈরী বাঁধ। এটি মহাদেশ থেকে লঙ্কাদুর্গ পর্যন্ত তিনি তৈরী করেছিলেন। বর্তমানে এটি জনমানবহীন পর্বতশ্রেণী মাত্র ও তার মধ্য দিয়ে সমুদ্র প্রবাহিত। সেতুবন্ধ থেকে ১৬ ফারসাক পূবদিকে কিখিন্দ (কিষ্কিন্ধ্যা) বানরদের পর্বতমালা অবস্থিত। বানরদের রাজা প্রতিদিন তার বানর বাহিনী নিয়ে গভীর অরণ্য থেকে এখানে হাজির হয় ও তাদের জন্য বিশেষ তৈরী আসনে এসে বসে। স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের জন্য ভাত রাঁধে ও পাতায় ক'রে তাই খেতে দেয়। সেই খাবার খেয়ে তারা আবার অরণ্যে ফিরে যায়। যদি তাদের অবজ্ঞা করা হয় তবে তা দেশের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারা যেমন সংখ্যায় বিরাট, স্বভাবে তেমনি বর্বর ও মারকুটে। চলিত বিশ্বাস অনুসারে তারা মানুষদেরই একটি জাতি। রাক্ষসদের সঙ্গে শ্রীরামের যুদ্ধকালে রামকে সাহায্য করার জন্য বানররূপ ধরেছিল। ওইসব গ্রাম রাম তাদের দানস্বরূপ দিয়ে গেছেন বলে মনে করা হয়। কোন মানুষ হঠাৎ তাদের মধ্যে গিয়ে পড়লে যদি সে তখন রামায়ণ আবৃত্তি করে বা রামের মহিমা বর্ণনা করে, তারা তা চুপ ক'রে শোনে। যদি কোন লোক বিপথ-গামী হয় এই বানরেরা তাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে, তাকে মাংস ও পানীয় খেতে দেয়। আসল ঘটনা যাই হোক, চলিত বিশ্বাস অনুসারে ব্যাপার-স্যাপার এই রকমই। এর মধ্যে সত্য কথা যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা অবশ্যই সুরমাধুর্যের প্রভাব।

সঙ্গীত প্রভাবের একটি বিবরণ হরিণ-শিকার প্রসঙ্গে এর আগেই দিয়েছি।

এই মহাসাগরের পূবদিকের দ্বীপগুলি ভারতের চেয়ে চীনের বেশি কাছে। এদের একটি হলো জাবজ দ্বীপ। হিন্দুরা একে সুবর্ণদ্বীপ বলে। পশ্চিম দিকের দ্বীপগুলি হলো জান্‌জ (= নিগ্রো) দের বসতি। এ দুয়ের মাঝামাঝি অঞ্চলে যে দ্বীপগুলি রয়েছে তাদের নাম রম্ম দ্বীপপুঞ্জ ও দিব দ্বীপপুঞ্জ (মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ)। কুমেইর দ্বীপপুঞ্জও এদের একটি।

স্বর্ণদ্বীপের উপসাগরে আগে মুক্তা-ঝিনুকের বসতি ছিল। এখন তারা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে। এর বদলে জাঞ্জদের দেশ সুফালে এখন মুক্তা-ঝিনুক পাওয়া যাচ্ছে। এজন্য লোকে বলে, স্বর্ণদ্বীপের মুক্তা-ঝিনুকরাই এ জায়গা ছেড়ে সেখানে চলে গেছে।

গরমের সময়ে ভারতে গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় বর্ষা হয়ে থাকে। এই বিশেষ কালকে বর্ষাঋতু বলা হয়। ভারতের যে অঞ্চল যত বেশি উত্তর দিকে ও পর্বতমালা দ্বারা ভাগ-বিভাগ যত কম বর্ষাও সেখানে তত বেশি পরিমাণ ও বেশি দিন স্থায়ী। মুলতানের লোকেরা আমায় বলতো যে তাদের অঞ্চলে বর্ষাঋতু নেই, কিন্তু উত্তরদিকের কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে বর্ষাঋতু রয়েছে। ভাতল ও ইন্দ্রবেদীতে আষাঢ় মাসে বর্ষাঋতু আরম্ভ হয় এবং ধারাবাহিক ভাবে চার মাসকাল স্থায়ী হয়; যেন জলের বালতি দিয়ে সব সময় জল ঢালা চলেছে। কাশ্মীর পর্বতমালার চারিদিকে জুদারী পর্বতচূড়া পর্যন্ত—দুনপুর ও বর্শাবর মধ্যে থাকা আরও উত্তরের দেশগুলিতে আড়াই মাস ধরে প্রচুর বৃষ্টি হয়। শ্রাবণ মাস থেকে বর্ষাঋতু আরম্ভ সেখানে, অথচ চূড়ার অপরদিকে বর্ষা নেই। কারণ, উত্তর দিকে মেঘ অত্যন্ত ভারী ও সমতলের খুব বেশি উপরে উঠিতে পারে না। তাই, তারা যখন পর্বতমালার কাছাকাছি হয় তখন পর্বতের-গায়ে ধাক্কা খায়। এর ফলে মেঘেরা জলপাই বা আঙুরের মতো পিষে যায় ও সমস্ত জল বর্ষার আকারে ঝরে পড়ে। মেঘেরা আর

পর্বতের ওপারে যাবার সুযোগ পায় না। সুতরাং কাশ্মীরে কোন বর্ষাঋতু নেই। কিন্তু আড়াইমাস ধরে সেখানে ধারাবাহিকভাবে তুষারপাত হয়। মাঘ মাস থেকে এর আরম্ভ। চৈত্রমাসের মাঝামাঝির পর একটানা বর্ষা শুরু হয় মাত্র কয়েকদিনের জন্য। তুষার গলে গিয়ে পথঘাট জমিন পরিষ্কার হয়ে যায় এর ফলে। এ নিয়মের কদাচিৎ ব্যতিক্রম ঘটে। আবহাওয়ার দিক থেকে ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশেরই কিছু না কিছু অসাধারণ বৈচিত্র্য রয়েছে।

দশ

ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন

[ক]

৬৩ থেকে ৭৩ এই দশটি পরিচ্ছেদে অলবেরুনী প্রধানতঃ হিন্দু জীবনের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণ, বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর অধিকাংশ তথ্যই তিনি শাস্ত্রীয় পুঁথি পুরাণ থেকে নিয়েছেন। যেসব ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যোগ হয়েছে, বেছে বেছে তার কতক অংশ এখানে দেওয়া হলো।

"তীর্থ ভ্রমণ হিন্দুদের মধ্যে বাধ্যতামূলক নয়। সম্পূর্ণরূপে আপন ইচ্ছা-নির্ভর ও একটি প্রশংসাজনক কাজ রূপে বিবেচিত। লোকেরা সাধারণতঃ কোন পবিত্র স্থান, বিশেষ প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি বা নদীগুলি দর্শন করতে যায়। সেখানে তারা পূজা-অর্চ্চনা করে, বিগ্রহদের পূজা দেয়, উপহার সামগ্রী অর্পণ করে, নানাপ্রকার স্তবস্তুতি প্রার্থনা জানায়, উপবাস করে, দানধ্যান করে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও অন্যান্যদের। মাথার চুল দাড়ি কামায় ও গৃহে ফিরে যায়।"

এরপর বায়ু ও মৎস পুরাণ থেকে অলবেরুনী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রধান পবিত্র নদীগুলির তালিকা দিয়েছেন। শুনিয়েছেন ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনীটি। এরপর জানিয়েছেন "যেসব স্থানের উপর বিশেষ কোন পবিত্রতা আরোপ করা হয়েছে সেখানেই হিন্দুরা পুণ্য অবগাহনের জন্য স্নানের ঘাট নির্মাণ ক'রে থাকে। এ ব্যাপারে তারা অতি উঁচু দরের শিল্প-নৈপুণ্য অর্জন করেছে। আমাদের লোকেরা (মুসলমানেরা) যখন এসব দেখে, খুব অবাক হয় এবং বর্ণনা দিতে অক্ষম হয়—ওই রকম গোছের কিছু তৈরী করা তো দূরের কথা। তারা অসংখ্য বড় বড় পাথর দিয়ে এগুলি তৈরী করে। একটি পাথরের সঙ্গে আরেকটি পাথরকে তীক্ষ্ণ ও শক্ত লোহার আঁকড়া দিয়ে জোড়া লাগানো হয়। এভাবে থাক থাক করে অসংখ্য ধাপ বিশিষ্ট সোপান-শ্রেণী তৈরী করে। এই সমতল

চত্বরের ন্যায় সোপানশ্রেণী দিয়ে স্নানের জায়গাটিকে ঘিরে দেওয়া হয়। এই বেষ্টনী একজন লোক যতখানি উঁচু তার চেয়েও অধিক উঁচু হয়ে থাকে। সোপানের মত ক'রে একটি পাথরের উপর আরেকটিকে এমন ভাবে সাজান হয় যে তারা সিঁড়ি তৈরী করে ক্রমশঃ উপরের দিকে চূড়োর মতো উঠে যায়। এর ফলে প্রথম সোপানটি স্নানের জায়গাটিকে ঘিরে রাস্তার মতো হয়। ধাপ ধাপ সিঁড়ির মতো উঠে যাওয়া চূড়াটি উঠানামার সোপানের কাজ করে। যদি একসঙ্গে বহু লোক স্নান করতে নামে ও অন্যেরা উঠতে থাকে সেজন্য তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় না এবং রাস্তাও কখনো অবরুদ্ধ হয় না। কারণ, সেখানে বহু সোপান রয়েছে ও উঠে আসা লোক নেমে চলা লোকদের পথ দেবার জন্য পাশে বা অন্য কোন সোপানে সরে যেতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে সব রকমের ঝঞ্ঝাট সহজেই এড়ানো সম্ভব হয়।

"মুলতানেও এরূপ একটি স্নানের ঘাট আছে। সেখানে তারা অবগাহন করে ও পূজা দেয়—অবশ্য তাদের ঐরূপ করতে যদি বাধা দেওয়া না হয়।"

"বরাহমিহির তার সংহিতা মধ্যে বলেছেন যে থানেশ্বরে একটি স্নানের ঘাট আছে, সেখানে হিন্দুরা বহুদূর থেকে এসে পুণ্যস্নান করে। এর কারণ রূপে তারা বলে যে 'গ্রহণ' কালে অন্য সব পবিত্র নদীর জল এই বিশেষ নদীতে এসে মিলিত হয়। এ কারণে ওই সময়ে এখানে অবগাহন করলে সব নদীতে স্নান করার পুণ্য অর্জিত হয়। বরাহমিহির আরো জানিয়েছেন—লোকেরা বলে থাকে যে রাহু যদি সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস না করতো তবে ঐ সব নদীরা এই নদীতে আসতো না।

"কতকগুলি স্থান আছে যাকে হিন্দুরা তাদের অনুশাসন ও ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত কারণ থেকে, পবিত্র-ভূমি রূপে মনে ক'রে থাকে, যথা—বারাণসী। তাদের সংসারত্যাগী পুরুষেরা সেখানে ঘুরে বেড়ায় ও বরাবরের জন্য বাস করে, ঠিক যেমন কাবা-র বাসিন্দারা বরাবরের

জন্য মক্কায় বাস ক'রে থাকে। তারা সেখানে তাদের জীবনের অবসান পর্যন্ত থাকতে চায়, কারণ মৃত্যুর পর এজন্য তারা ভাল প্রতিদান পাবে। তারা বলে, একজন খুনীও যদি বারাণসীতে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে সে তার সেই অপরাধের দণ্ড থেকে রেহাই পায়। এই স্থানটির পবিত্রতার কারণ তারা এইরূপ বলে থাকে—

* * * *

"অনুরূপ আর একটি স্থান হচ্ছে পুকর (পুষ্কর)। এটি সম্বন্ধে এ রকম কাহিনী প্রচলিত ঃ ব্রহ্মা একদিন সেখানে যজ্ঞ করছিলেন। সে সময়ে ঐ যজ্ঞাগ্নি থেকে এক শূকর আবির্ভূত হলো। সুতরাং তারা সেখানে তার মূর্তিকে শূকরের রূপ দিয়েছে। এখানে, শহরের বাইরে তিনটি স্নানের ঘাট নির্মাণ করেছে তারা। এই স্থানকে বিশেষ পুণ্যস্থলী রূপে মনে করা হয় ও এখানে পূজা-অর্চনা করা হয়।

"এ ধরনের আরেকটি স্থান হলো থানেশ্বর। একে কুরুক্ষেত্র বা কুরুর ভূমি নামেও উল্লেখ করা হয়। ইনি একজন চাষী, সাধু ও পুণ্যাত্মা ছিলেন। দৈবশক্তির প্রভাবে তিনি অনেক অলৌকিক কার্য করেছিলেন। এই কারণ থেকে দেশকে তার নামে নামিত করা হয় ও তাকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। এ ছাড়া থানেশ্বর ভারত যুদ্ধের স্থানরূপে বাসুদেবের কর্মক্ষেত্র ও অন্যায়কারীদের বিনাশস্থল। এই কারণে লোকেরা এখানে তীর্থ করতে আসে।

"মথুরাও একটি পুণ্যভূমি। এখানে প্রচুর ব্রাহ্মণের বসবাস। বাসুদেব সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লালিত পালিত হয়েছিলেন এরই নিকটবর্তী নন্দগোলাতে। সেজন্য এই অঞ্চলকে পবিত্র মনে করা হয়।

"বর্তমানে হিন্দুরা কাশ্মীরেও যায়। তারা মুলতানও আসতেন এখানকার মন্দিরটি ধ্বংস করে দেওয়ার পূর্বে।"

[খ]

"প্রতিদিন সাধ্যমত ভিক্ষাদান করা তাদের কাছে বাধ্যতামূলক। তারা অর্থকে এক বছর তো দূরকথা এক মাসও পুরোনো হতে দেয় না। এর ফলে তা অজ্ঞাত ভবিষ্যতের (পরলোকের) সঞ্চয় হয়ে দাঁড়াবে। ওই অজ্ঞাত ভবিষ্যত কবে আসবে বা তার চেহারা কী রকম তা কেউ অবশ্য জানে না।

"চাষবাস ও পশুপালনের দ্বারা যা সে রোজগার করে তার এক নির্দিষ্ট ভাগ প্রথমে সে কর স্বরূপ দেশের শাসককে দিতে দায়বদ্ধ। এই কর চাষযোগ্য ভূমি বা চারণভূমির উপর ধার্য করা হয়। এছাড়াও আবার আয়ের এক ষড়াংশ শাসককে দিতে বাধ্য থাকে প্রজাগণের প্রাণ, ধন-সম্পত্তি ও পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের স্বীকৃতি রূপে। এই দায় সাধারণ মানুষেরও রয়েছে। কিন্তু তারা সব সময়েই তাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে মিথ্যা বিবরণ দেয় ও এইভাবে ফাঁকি দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও ওইরূপ একই কারণে কর দিতে হয়। একমাত্র ব্রাহ্মণরা এই সব কর প্রদানের দায় থেকে রেহাই পেয়ে থাকে।

"ওই সব কর পরিশোধের পর উপার্জনের যা অবশিষ্ট থাকে তা কীভাবে ব্যয়িত হবে সে নিয়ে মতভেদ আছে। কিছু লোক এর এক-নবমাংশ ভিক্ষাদানের জন্য উদ্দিষ্ট ক'রে থাকেন। কারণ তারা একে তিনভাগে ভাগ ক'রে থাকেন। একভাগ পৃথক ক'রে রাখা হয় মনকে আশংকামুক্ত রাখার জন্য বা ভবিষ্যতের জন্য। দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হয় লাভ উৎপাদনের জন্য। তৃতীয় ভাগের এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ পুরো অর্থের এক-নবমাংশ) ভিক্ষাদানে ব্যয় করা হয় ও অপর দুভাগও ওইরূপ নীতিতে ব্যয় করা হয়।

"অপর কিছু লোক একে চার ভাগে ভাগ করে। প্রথম ভাগ সাধারণ ব্যয় নির্বাহের জন্য। দ্বিতীয় ভাগ মহৎ মনের উদার কর্মাদির জন্য। তৃতীয় ভাগ ভিক্ষাদানের জন্য। চতুর্থ ভাগ সঞ্চিত রাখা

হয়। এই সঞ্চয় কখনো তিন বছরের সাধারণ ব্যয়ের অপেক্ষা অধিক হবে না। যদি কখনো অধিক হয় তবে ঐ অধিক অংশ ভিক্ষার্থে ব্যয় করা হয়।

"সুদ বা টাকা ধার দিয়ে তার উপর কোনরূপ লভ্যাংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ। এ দ্বারা একজন ব্যক্তি যে পাপ অর্জন করে তার পরিমাণ ঐ লভ্যাংশ বা সুদ মূলধনকে যে পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে তার পরিমাণের সঙ্গে সমান। এ ধরনের সুদ একমাত্র শূদ্রেরা নেবার বিধান রয়েছে। তাও মূলের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগের চেয়ে বেশি নয় (অর্থাৎ শতকরা দুভাগ)।"

[গ]

"মূলতঃ, কোনরূপ প্রাণীহত্যা করা হিন্দুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ঠিক যেমনটি খ্রীষ্টান ও ম্যানেকীয় (Manichaeans)-দের ক্ষেত্রে রয়েছে। তা সত্ত্বেও মানুষদের মনে মাংস ভোজনের স্পৃহা রয়েছে এবং এজন্য তারা সব সময়েই তার বিরুদ্ধে যায়—এমন সব অনুশাসন লঙ্ঘন করতে পিছু হটে না। এজন্য ওই নিয়মগুলি এখানে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য। কারণ, তারাই হল ধর্মের প্রহরী আর ধর্ম ব্রাহ্মণদের লোভ ও কামনার বশীভূত হতে নিষেধ করে। ঠিক এই একই কারণে খ্রীষ্টানদের মধ্যেও যারা বিশপ অপেক্ষা উপরের পদে অধিষ্ঠিত, ক্যাথলীক সম্প্রদায়, তাদের উর্দ্ধতন যাজক ও যারা নিম্নপদধিকারী হলেও সন্ন্যাস নিয়েছেন—তাদের পক্ষে এই বিধি মেনে চলা আবশ্যিক।

এই কারণে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে প্রাণীহত্যার বিধি চলিত রয়েছে। তবে সব প্রাণীই নয়, মাত্র নির্দিষ্ট কতক প্রাণীকে। যে সব প্রাণীকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে, তাদের যদি অপর কোন কারণে মৃত্যু ঘটে তবে সেই মৃত মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। যে সব প্রাণীকে হত্যা করতে দেওয়া হয় তারা হল : ভেড়া, পাঁঠা,

হরিণ, খরগোশ, গণ্ডার (?-gandha), মহিষ, মাছ, জল ও স্থল পক্ষী—যথা: চড়ুই, কপোত, মোরগ, পায়রা, ময়ূর ও অন্যান্য সব প্রাণী যারা মানুষের কাছে ঘৃণিত বা বিষাক্ত রূপে বিবেচিত নয়।

"যে সব নিষিদ্ধ তা হল—গরু, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, উট, হাতী, গৃহপালিত পশু-পাখি, কাক, তোতা, বুলবুল, সব রকমের ডিম এবং মদ। শেষেরটি শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তারা মদপান করে তবে বিক্রী করতে সাহস পায় না, কেন না, মাংস বিক্রী করার অনুমতি নেই তাদের।

"কতক হিন্দু বলে যে ভরতের সময়ের পূর্বে গোমাংস ভোজনের চলন ছিল তাদের মধ্যে। সে সময়ে এমন কতকগুলি যজ্ঞ প্রচলিত ছিল যার অঙ্গ ছিল গো-হত্যা করা। পরে, মানুষ ক্রমশঃ ক্ষীণকায় হয়ে পড়ার দরুণ, তাদের কর্মক্ষমতা আগের তুলনায় লোপ পাওয়ায়, উহা নিষিদ্ধ হয়। ঠিক এই কারণেই বেদেরও বিভাজন ঘটেছে। পূর্বে বেদ এক ছিল, পরে তাকে চার ভাগ করা হয়েছে—মানুষের পক্ষে এর অধ্যয়ন সম্ভবপর করে তোলার জন্য। কিন্তু একথা তথ্যের দ্বারা একেবারেই সমর্থিত হয় না। কারণ, গোমাংসের উপর নিষেধাজ্ঞা আংশিক বা শিথিল ধরনের নয় বরঞ্চ তা উপরের যে কোন নিষেধ বিধি অপেক্ষা অতি কঠোর ও গুরুত্ব সহকারে প্রযুক্ত।

অপর কতক হিন্দু আমায় বললেন যে ব্রাহ্মণেরা গো-মাংস ভোজনহেতু রোগে ভুগতেন। কারণ, তাদের দেশ গরম। অপরদিকে দেহের ভিতর অংশ ঠাণ্ডা, সেখানে স্বাভাবিক উত্তাপ বেশ কম। এজন্য এখানে হজম-ক্ষমতা এত দুর্বল যে তাকে বলবান করার জন্য খাওয়ার পর পানের পাতা খেতে হয়, সুপারী চিবোতে হয়। গরম পান দেহের মধ্যে উত্তাপের বৃদ্ধি ঘটায়, পাতার সঙ্গে ব্যবহৃত চূণ আর্দ্রতা কমায় এবং সুপারী দাঁত, মাড়ি ও পাকস্থলীর পক্ষে বলকারক। এই রোগে ভোগার দরুনই তারা গোমাংস নিষিদ্ধ করে, কারণ ইহা প্রধানতঃ মোটা ও ঠাণ্ডা।

"আমি এ বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসংশয় হতে পারিনি। সুতরাং এই বিধির উদ্ভব সম্পর্কে কোন্ মতটি ঠিক সে বিষয়ে আমি স্বভাবতই দ্বিধাগ্রস্ত।

"অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, গরু হচ্ছে এমন একটি প্রাণী যে নানাভাবে মানুষের সেবা করে। তারা মানুষের মালপত্র টানে, জমি চাষ ও বীজ-বোনার কাজে সাহায্য ক'রে আবাদের সহায়ক হয়। দুধ ও দুধ থেকে তৈরী নানারকম খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা গৃহস্থালীর ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার করে। তার মল বা গোবরও মানুষের প্রয়োজনে লাগে। এমন কি তার শ্বাস-প্রশ্বাসকে পর্যন্ত শীতকালে মানুষ কাজে লাগায়। এই সব কারণেই গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল মনে হয়। ঠিক যেমন আল্‌হাজ্জাজ উহা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কেননা, তার কাছে অভিযোগ আসতে সুরু করলো যে ব্যাবিলন ক্রমেই বেশি করে মরু অঞ্চলে পরিণত হয়ে চলেছে।

"ভারতীয়দের একখানি বই থেকে এই অংশটি আমাকে শোনানো হয়েছিল: সব প্রাণীই এক ও সমান। তাকে ভোজন চলিতই হোক আর নিষিদ্ধই হোক। পার্থক্য একমাত্র শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও বলবত্তার দিক থেকে। নেকড়ে বাঘের ক্ষমতা রয়েছে ভেড়াকে হত্যা করার, তাই ভেড়া নেকড়ের খাদ্য। ভেড়া যেহেতু নেকড়েকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে না, তাই সে নেকড়ের শিকার। আমি নিজেও হিন্দুদের বইতে এই ধরনের লেখা দেখেছি। যাই হোক, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী একমাত্র বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যেই দেখা দেয় জ্ঞানচর্চ্চার ফলে। তখন এমন একটি স্তরে তার প্রজ্ঞার উত্তরণ ঘটে, যে তার কাছে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল দুই-ই সমান রূপে প্রতিভাত হয়।"

[খ]

"সাধারণ লোকেরা মনে করে যে গণিকা বৃত্তি হিন্দুদের মধ্যে একটি স্বীকৃত প্রথা। কিন্তু কাবুল যখন মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হলো

তখন সেখানকার ইস্পাবাদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সময় শর্ত ক'রে নিলেন যে তাকে যেন গোমাংস ভোজন ও অস্বাভাবিক যৌনসংসর্গ করতে বাধ্য করা না হয় (যা প্রমাণ করে যে তিনি একটির ন্যায় অন্যটিকেও গভীরভাবে ঘৃণা করতেন)। তাই, প্রকৃত ঘটনা, লোকে যে রকম ভাবে সে রকম নয়। আসল কথা হলো, হিন্দুরা গণিকাবৃত্তিকে শাস্তি প্রদান করার ব্যাপারে বিশেষ কঠোর নন। এজন্য রাজাই দায়ী, জাতি নয়। যে মেয়েরা হিন্দুদের দেব-মন্দিরগুলিতে নাচে, গায় বা অভিনয় করে তাদের অভাব দেখা দিলে কোন ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতই মনোকষ্ট ভোগ করবে না। সহরের বিশেষ আকর্ষণ রূপে রাজাই তাদের কাজে লাগান। প্রজাদের নিকট আমোদ-প্রমোদের টোপ রূপে ব্যবহার ক'রে থাকেন। এর কারণ অন্য কিছু নয়—পুরোপুরি আর্থিক। সৈন্যবাহিনী পোষণের জন্য রাজকোষ থেকে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় তাকে এই বৃত্তি থেকে প্রাপ্ত জরিমানা ও কর দ্বারা তারা পূরণ করতে চান।

"বায়াঈদ (Buyide) রাজা আদুদ আলদাউলাও ঠিক এই পন্থাই অনুসরণ করেছিলেন। এছাড়া আরো একটি দিকে অবশ্য লক্ষ্য ছিল তার। সেটি হলো অবিবাহিত সৈন্যদের কামনার আগুন থেকে প্রজাদিগকে রক্ষা করা।"

[৬]

"যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করতে চান তবে বিচারক সেই ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার অভিযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত করার মতো দলিল পেশ করতে বলেন। এই দলিল কোন সুপ্রচলিত ভাষায় লিখিত হওয়া চাই। যদি ঐরূপ কোন লিখিত দলিল না থাকে সেক্ষেত্রে সাক্ষীদের দেওয়া সাক্ষ্যের উপর নির্ভর ক'রে বিরোধের মীমাংসা করা হয়।

"সাক্ষী চারজনের কম হলে চলবে না, বেশি হলে আপত্তি নেই।

যদি কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে বিষয়টির সত্য-মিথ্যা পুরোপুরি প্রতিপন্ন হয় ও তা বিচারকের সন্তুষ্টি উৎপাদনে সমর্থ হয় তবে তিনি তাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে একমাত্র ঐ সাক্ষীর একক সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই বিরোধটির নিষ্পত্তি করতে পারেন। তিনি কিন্তু গোপনে খোঁজ খবর চালিয়ে সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা সমর্থন করেন না। জনতার মতামত বা ইঙ্গিতাদি থেকে কোনরূপ সিদ্ধান্ত বা যুক্তিতে উপনীত হবার চেষ্টা করেন না। কোন একটি বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত সত্যের জের টেনে তার ভিত্তিতে অন্য একটির উপর আলোক লাভের চেষ্টা করেন না। কিম্বা নানারকম কৌশল অবলম্বন ক'রে সত্য নিষ্কাশনের চেষ্টা করেন না। ইয়াস ইবন মুয়াওইয়া কিন্তু এর সবগুলি পন্থাই অবলম্বন করতেন এজন্য।

"যদি অভিযোগকারী তার দাবী প্রমাণে অক্ষম হয় তবে অভিযুক্তকে শপথ নিতে হয়। তবে তার পরিবর্তে সে অভিযোগকারীকে শপথ নেবার আহ্বান জানাতে পারে এই বলে—'তুমি শপথ ক'রে বলো যে তোমার দাবী সত্য; তাহলে তুমি যা দাবী করছো তা আমি তোমাকে দেবো'।

"দাবীর বিষয়টির গুরুত্ব বা মূল্য অনুযায়ী শপথেরও বিভিন্নতা রয়েছে। যদি বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হয় এবং অভিযোগকারী যদি রাজি হয় যে অভিযুক্ত শপথ নিতে পারে তাহলে অভিযুক্ত পাঁচজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণের সম্মুখে সাধারণ ভাবে এইপ্রকার শপথ নেয়—'যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি তবে ওই ব্যক্তি যেরূপ মূল্যের দাবী করেছেন তার আটগুণ মূল্যের জিনিষ ক্ষতিপূরণ দিতে আমি বাধ্য থাকবো'।

"এর চেয়ে একধাপ গুরুত্বপূর্ণ শপথ ক্ষেত্রে তাকে এক প্রকার বিষাক্ত পানীয় গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এই পানীয় অতি সাংঘাতিক রকমের। কিন্তু সে যদি সত্য কথা বলে থাকে তবে সে পানীয় তার কোন রকম ক্ষতি করবে না।

"এর চেয়ে আর এক ধাপ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হলো এই রকম— তারা লোকটিকে একটি গভীর ও খরস্রোতা নদীর কাছে বা একটি গভীর জলে ভরা কুয়ার কাছে নিয়ে আসে। সে তখন জলকে উদ্দেশ্য করে বলে—"যেহেতু তুমি পবিত্র দেবদূতগণের একজন এবং যা প্রকট সব কিছুই জানো, সুতরাং আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি তবে আমায় বধ করো, আর যদি আমি সত্য কথা বলে থাকি তবে আমায় রক্ষা করো।" এরপর পাঁচজন লোক তাকে ধরাধরি ক'রে সেই জলের মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। যদি সত্য বলে থাকে তবে সে জলে ডুবে মারা পড়বে না।

"এর চেয়ে আরো একধাপ গুরুত্বপূর্ণ শপথ এই ধরনের: সেই শহর বা রাজ্যের সব থেকে নামকরা মন্দিরে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত দুজনকেই বিচারক পাঠিয়ে দেন। সেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেদিন উপবাস ক'রে কাটাতে হয়। পরদিন সে নতুন পোষাক পরে অভিযোগকারীকে নিয়ে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে। তখন পুরোহিত বিগ্রহের দেহে জল ঢালেন ও সেই জল তাকে খেতে দেন। যদি সে তখন সত্য কথা না বলে তবে তৎক্ষণাৎ রক্ত বমি করবে।

"আরো এক ধাপ উঁচু রকমের পরীক্ষা ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে একটি দাঁড়িপাল্লার একদিকে বসিয়ে ওজন করা হয় ও দাঁড়িপাল্লা সেই ভাবে রাখা হয়। এরপর অভিযুক্ত ব্যক্তি তার নির্দোষীতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবার জন্য সকল অশরীরীকে, দেবদূতদের ও দেবতাবর্গকে একে একে আবেদন জানিয়ে চলে ও যা সে সময়ে বলে তা একখণ্ড কাগজে লিখে নিজের মাথায় আটকে দেয়। তারপর তাকে আবার দাঁড়িপাল্লায় তোলা হয়। যদি সে সত্য কথা বলে থাকে তবে তার ওজন এবার আগের থেকে বেশি হবে।

"এর চেয়ে আরো একধাপ কঠিন পরীক্ষা রয়েছে। এজন্য তারা ঘি ও তিলতেল সমান পরিমাণে নিয়ে একটি পাত্রে তা গরম করে।

তারপর এর মধ্যে একটি পাতা ছুঁড়ে পরখ করে নেয় তা কতটা গরম হয়েছে। যখন ফুটন্ত অবস্থা চরমে পৌঁছায় তখন তার মধ্যে একখণ্ড সোনা ছুঁড়ে দেওয়া হয় ও অভিযুক্তকে আদেশ করা হয় তার হাত দিয়ে ঐ সোনার খণ্ডটি তুলে আনতে। যদি সে সত্য বলে থাকে তবে খণ্ডটি ঠিক সে তুলে আনবে।

"সর্বোচ্চ পরীক্ষাটি এই রকমের। তারা একটুকরো লোহাকে এরূপ গরম করে যে তা প্রায় গলে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছায়। তারপর একটা চিমটে দিয়ে ঐ টুকরোটি অভিযুক্তের হাতের উপর রাখে। ঐ সময়ে তার হাতে কয়েকটি ছড়ানো ধান ও তার উপর কোন একটি গাছের চওড়া পাতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাকে ঐ ভাবে সেটি নিয়ে সাত পা হেঁটে যেতে বলা হয়—তারপর সেটি মাটিতে ফেলে দিতে পারে।

শব্দসূচী

ব্যক্তি ও বংশ

অগস্ত্য, গ্রন্থকার—৩৯
আনন্দপাল, রাজা—৪০, ৭৬, ৭৭
আর্যভট্ট ১ম ও ২য়—১২, ১৩, ৪২, ৪৩, ৬৪, ৬৬
ইসদেনদিয়াদ, রাজা—২২
উগ্রভূতি, গ্রন্থকার—৪০
উৎপল, গ্রন্থকার—৪৩, ৪৪
ঐন্দ্র, গ্রন্থকার—৪০
ওয়খান শাহ—৯১
কনিষ্ক বা কণিক রাজা—৭৬
কপিল, সাংখ্যকার—২৯, ৩৯
কমলু, রাজা—৭৬
কল্যাণবর্মা, গ্রন্থকার—৪৪
কল্লর—মন্ত্রী, রাজা—৭৬
গর্গ, গ্রন্থকার—৪৩
গরুড়, গ্রন্থকার—৬২
গ্রীক—২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৪৫
বংশ—৭৩
গ, রাজা—২২
গৈসিত, গ্রন্থকার—৪০
চন্দ্র, গ্রন্থকার—৪০
জউর, রাজা—৮৪, ৯৪
জরাথুস্ত্র—২২
জলম ইবন শইবান—৩৪
জয়পাল, রাজা—৭৬
জীবশর্মণ, গ্রন্থকার—৪৪
জৈমিনী, গ্রন্থকার—৩৯
টলেমি—৮৩
ত্রিলোচন পাল—৭৬, ৭৭
দিব্যতত্ত্ব, গ্রন্থকার—৪৩
দিবাকর, „ —৪৪
দেবল, „ —৩৯
দেবাকৃতি, „ —৪৪
নাগার্জুন, রসায়নবিদ—৫৮
নারদ, গ্রন্থকার—৩৩
পতঞ্জলি—৪, ২৯, ৩৯
পরাশর, জ্যোতির্বিদ—৪৩
পরেশ্বর, গ্রন্থকার—৪৪
প্রদ্যুম্ন, „ —৪৪
পাণিনি, „ —৪০
পাণ্ডু—৩২
পিঙ্গল, গ্রন্থকার—৪০
পীরুবান, গ্রন্থকার—৪৪
পুষ্কল, গ্রন্থকার—৪৩
পুলিশ, „ —৪১, ৪২ ৬৪, ৭০
পৃথুদক স্বামীন, গ্রন্থকার—৪৪
ফিরদৌসী—৩
বঙ্গাল, গ্রন্থকার—৪৪
বরাহমিহির—৬. ১২, ১৬, ২৫ ৪২, ৪৩, ৪৪, ৬৫, ৬৬, ৯৫
বলভদ্র, গ্রন্থকার—৪২, ৪৩, ৪৪
বল্লভ, রাজা—৭০, ৭১, ৭১, ৭৩
বসুক্র, বেদ ব্যাখ্যাতা—৩৭
ব্রহ্মগুপ্ত—৭, ১২, ১৬, ৪১, ৪২, ৬৫, ৬৬, ৭০, ৭৩
ব্রহ্মা, গ্রন্থকার—৪৩
ব্যাদি, রসায়নবিদ—৫৮, ৫৯

ব্যাসদেব—৩২, ৩৭, ৪৬
বিক্রমাদিত্য—৫৮, ৫৯, ৭১, ৭২
বিজয়নন্দিন, গ্রন্থকার—৪৩
বিত্তেশ্বর „ —৪৩
বিমলবুদ্ধি „ —৪৪
বিষ্ণুগুপ্ত „ —৪১
বুদ্ধ „ —৪৪
বৃহস্পতি „ —৩৯
বোলর শাহ—৯১
ভট্টিল, গ্রন্থকার—৪৩
ভানুযশা „ —৪২, ৪৩
ভার্গব „ —৪৩
ভীম, রাজা—১৬
ভীমপাল, রাজা—১৬
ভোজদেব, রাজা—৫৯
মণিথ, গ্রন্থকার—৪৪
মনু, „ —৪০, ৪৩
ময়, „ —৪৪
মসুদ, সুলতান—৩, ৪
মহাদেব, গ্রন্থকার—৪৪
মাণ্ডব্য „ —৪৩
মামুনী বংশ—১
মাহমুদ, সুলতান (আমীর)—১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯, ১০, ১৫, ২৩, ৩৪
মুহম্মদ ইবন—২৩, ৩৩
যবনাচার্য, গ্রন্থকার—৪৪
যাজ্ঞবল্ক্য „ —৩৯
লগতুরমন, রাজা—১৬
লাট, গ্রন্থকার—৪১
লোকানন্দ, গ্রন্থকার—৪৩
শনৌক, ঋষি—৩৭
শাকট, গ্রন্থকার—৪০
শ্রীসেন, গ্রন্থকার—৪১
শ্রীহর্ষ (হর্ষবর্দ্ধন), রাজা—৭১
শুক্র, গ্রন্থকার—৩৯
শুক্রাচার্য, „ —৩৭
শুখনান শাহ—৯১
সক্রেটিস—২৭, ৪৫, ৬৫
সগর, রাজা—২২
সংঘিল, গ্রন্থকার—৪৪
সত্যাচার্য, গ্রন্থকার—৪৪
সন্ন্যাসী গৌড়, গ্রন্থকার—৩৯
সবুক্তগীন, সুলতান—৪, ৫, ১৫, ২৩
সর্ববর্মণ, গ্রন্থকার—৪০
সামদ (সামন্ত), রাজা—১৬
সামনীবংশ—১৫, ২৩
সারস্বত, গ্রন্থকার—৪৪
হিউয়েন সাঙ—৮, ৯

স্থান

অনহিলবার শহর—৪১, ৭২, ৮৯
অন্ধ্রদেশ—৪৭
অভপুরী—৮৪
অম্বিল—৯৩
অযোধ্যা—৮৪
অরদীন—৮৬
অর্কতীর্থ—৮৪
অলমনসুরা (বহমানওয়া)—২৩, ৪৭, ৭২, ৯০

অলমস্থরা (মূলস্থান, মূলতান)—
মূলতান দেখুন
র—৮৭
-৯১
অয়োর—৯০
আদিত্যহোর—৯০
আদ্দিশতন—৯১
আধরবইজান—২২, ৮১
আনার—৯০
আর্যাবর্ত—৭২
আশী—৮৬
ইন্দ্রবেদী—৯৫
ইরাক—২২
উজ্জয়নী—৮৬
উদনপুর—৪৭
উদরবিশাউ—৮৪
উবর্য্যাহার—৮৪
উস্মালনগর—৯৪
কওয়ীতল—৯০
কঙ্কণ প্রদেশ—৮৭
কচ্ছ প্রদেশ—৯৩
কনৌজ—২৩, ৭৫, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯০
কন্দ—৮৭
কম্বায়েত—৯৩
কর্ণাটক—৪৭
কাঞ্চী—৮৪
কান্দি—৭০
কাবুল—১, ১৫, ২৩, ৭০, ৭৫, ৮১, ৮২, ১০৩
কাশ্মীর—১০, ২৩, ২৪, ৩৫, ৪৩, ৪৬, ৪৮, ৬৯, ৭৫, ৭৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৯
কিখিন্দ (কিষ্কিন্ধ্যা)—৯৪
কুটী—৯০
কুনক—৮৪
কুরহ—৮৪
কুরুক্ষেত্র—৯৯
খওয়ারিজম বা চোরাসমিয়া—১
খিবা—১, ৩, ৬
খুরাসান—২২, ২৩, ২৫, ৮১
গঙ্গাসায়র—৮৫
গজনী বা ঘজনা—১, ৫, ৬, ৭, ১৫, ২৩, ৩৪, ৭০, ৭৮, ৯০
গান্ধার বা অলকান্দাহার—২৩, ৬৮
গ্রীস—২২
গৌড়—৪৭
চীন—২২, ৮১, ৮৬, ৯৫
জজ্জনীর—৯০
জজ্জমৌ—৮৪
জনপ—৮৪
।—৮৬
:—৯০
নগর—৯৩
ঝিলম বা জইলাম শহর—৬৮, ৭০
তান—৮৭
তিলবত—৮৫
থানেশ্বর (স্থানেশ্বর)—৯, ৩৪, ৭৮, ৮৩, ৯৮, ৯৯
দণ্ডক—৮৭
দহমাল—৯০

দারবদ—৯৩
দারায়ুর—৮৪
দ্রাবিড়—৪৭
ও
লাক্কাদ্বীপ) ৮০, ৯৫
দিয়ামৌ—৯০
দুগুমপুর—৮৪
দুনপুর—৭০, ৯০
দুগুম—৮৫
দুদহী—৮৬
ধার শহর—৫৯, ৮৬, ৮৭
নগরকোট—৭৬
নন্দগোলা—৯৯
নমাতুর—৮৭
নমিয়্যা—৮৭
নেপাল বা নইপাল—৮৫
পঞ্জয়াবর নগর—৯৩
পদনার—৯৩
পরওয়ার—৮৪
প্রয়াগের বৃক্ষ—৮৪
পাটলীপুত্র—৮৪
পানিপথ—৯০
পারস্য—২২, ২৩, ২৫
পুরুষাবর—৭০, ৯০
পুষ্করতীর্থ বা পুকর—৯৯
পিঞ্জৌর—৯০
রগ—৯৩
বজান—৮৬
বরহমশীল—৮৪
বল্লাওয়ার—৯০
বল্লভী নগর—৬০, ৬১, ৯৩
বর্শাবর—৯৫
বহমানওয়া—২০, ৪৭, ৭২, ৯০
বামহুর—৮৬
বারাণসী—১ ২৪, ৪৩, ৪৬, ৭৪, ৮৪, ৯৮
বারী শহর—৮২, ৮৪, ৮৫
বারোঙ্গ দুর্গ—৭৯, ৮০
বালখ বা বক্ত্র—২২, ২৩
বিহত শহর—৮৫
বিহরোজ—৮৯, ৯৩
বৈহান্দ—৬৮, ৭০
ভাটী—৯০
ভাতল—৯৫
ভিল্লমাল—৪১
ভূমিহর—৮৭
ভৈলসান—৮৬
মইওয়ার—৮৬
মথুরা—৮৩, ৯৯
মধ্যদেশ—৮২
মন্দগীর—৮৭
মন্দহূকুর—৯০
মরহট্টা দেশ—৮৭
মলয় —৮৪
মহকাল (মহাকাল)—৮৬
মান্দকাকোর—৭০
মালব—৪৭, ৮৬
মাহুয়া—৮৬
মীরাট—৯০
মুঙ্গের—৮৪

মূলতান (মূলস্থান)—১, ৯, ২৩, ৩৩, [illegible]
৭৫, ৯০, ৯৫, ৯৮, ৯৯
মোসুল—৮২
যশুরৌর—৮৬
যত্নুরা—৮৬
রাজওয়ারী শহর—৯১
রাজগীর দুর্গ—৯০
রাজৌরী—৮৬
রামেশ্বর সেতুবন্ধ—৬৮, ৯৪
রিহনপুর—৮৯
লড্ড—৯০
লমঘান—৭০
লার—৪৭, ৮৯
লাহোর—৯, ৬৯, ৯৩
লোহয়ানী নগর—৬৯, ৯০, ৯৩
শালকোট—৭০
শিলতাস—৯১
শিলহট—৮৫
শিয়ালকোট—৯
শির্ষাহর—৯০
সন্দান—৯৩
সমরকন্দ—৪৫
সহস্তা—৮৬
স্থানেশ্বর—থানেশ্বর দেখুন
সিজিস্তান (শকস্তান)—২৩
সিংহল—৯৩
সিন্ধুপ্রদেশ—২০, ৪৯, ৭৫, ৭৯, ৮২
সিরিয়া—২২
সুবায—৯০
হুয়ারা—৯৩

নদী

জইলাম বা ঝিলম নদী—৯০
রাবি—৯
সিন্ধু নদী—৯, ১৫, ২৩, ৬৮, ৬৯, ৭২,
৮৮, ৯০, ৯১, ৯২
নদী তালিকা—৬৭

দেবমূর্তি

কাশ্মীরের শারদামূর্তি—৩৫
থানেশ্বরের চক্রস্বামী—৩৪, ৩৫, ৭৮
মূলতানের সূর্য-মূর্তি—৩৩-৩৪
সোমনাথ মন্দির ও শিবলিঙ্গ—৩৪, ৩৫,
৭৫, ৭৭, ৭৮, ৭৯

বিবিধ

অলকান্দুন অলমসুদী—৪, ৭
অক্ষক্রীড়া—৫৩
ঋণ ও সুদের হার—১০১
কর বা রাজস্ব—১০১
কাগজ তৈরী, প্রথম—৪৫
গণ্ডার—৮৭-৮৮, ১০২
গণিকাবৃত্তি—১০২-১০৩
গীতা—২৯, ৪০
গোমাংস ভোজন—১০২
গোবর, গোময়—৫০, ৫১

গুপ্তকাল—৭, ৭১, ৭৩
দাবাখেলা—৫৩
নাদি সংহিতা—১২
প্রাণীহত্যা—১০
পুরাণ—৩৮-৩৯
পুলিশ সিদ্ধান্ত—৪১, ৪২
বর্ণমালা—৪৬, ৪৭
বল্লভ-কাল—৭১, ৭৩
ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত—৪১, ৪২
বিক্রম-সংবৎ—৭১, ৭২, ৭৩
বিষ্ণুধর্ম—২৯, ৩৯
বিষ্ণু পুরাণ—২৯, ৩৭, ৩৮
বৃহৎ-সংহিতা—৬, ৩৫
বেদ—১৭, ৩৬-৩৮
বৌদ্ধধর্ম—২২, ২৩
ভৃগু সংহিতা—১২
মহাভারত—৩২, ৪০
মাণিধর্ম—২২
মিফতাহ-ইলম-আলহাইয়া-১৩
মুক্তা-ঝিনুক—৯৫
যোগদর্শন—৪,৬, ২৯
রামায়ণ—৪০
শককাল—৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪
শরভ—৮৭
শ্রীহর্ষ সংবৎ—৭১, ৭৩
সংস্কৃত ভাষা—১, ১২, ১৮-২০, ২৬
সাংখ্য দর্শন—৪, ৬, ২৯, ৩৯
স্মৃতি—৩৯
হিন্দুদের আজব প্রথাদি—৫১-৫৩
হিন্দু পোষাক—৫০, ৫১